না

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

অমিয় চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

ভূমিকা

"মনপবন" ও "যৌবনজ্বালা"র মতো "না"তেও আমি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছি। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে এই বইগুলি আমার আত্মজীবনীর অঙ্গ তা হলে ভুল করবেন। গল্প বলার একটি বিশেষ রীতি আমি অবলম্বন করেছি উদ্‌ভাবনের ভাগ কমিয়ে আনবার জন্যে। তা হলেও গল্প গল্পই। কাহিনী কাহিনীই। চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

অন্নদাশঙ্কর রায়

২রা ডিসেম্বর ১৯৫১

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

বড় উপন্যাস

যার যেথা দেশ

অজ্ঞাতবাস

কলঙ্কবতী

দুঃখমোচন

মর্ত্তের স্বর্গ

অপসরণ

ছোট উপন্যাস

আগুন নিয়ে খেলা

পুতুল নিয়ে খেলা

অসমাপিকা

ছোটগল্পের বই

প্রকৃতির পরিহাস

মনপবন

যৌবনজ্বালা

না

(১)

হাওয়াবদলের জন্যে সেবার যেখানে যাই সেটা সাঁওতাল পরগনার একটা নামকরা জায়গা। গিয়ে দেখি সে-বছর তেমন লোকসমাগম নেই, বাড়ীগুলো খালি পড়ে আছে। বেশ তো, আমি তো জনতা চাইনি, আমি চেয়েছি বিজনতা। কিন্তু দিন পনেরো পরে আমার আর ভালো লাগল না। মনে হলো কথা বলার জন্যে জনমানব না থাকলে বিজনতায় সুখ নেই।

তখন আমি সকালসন্ধ্যা রেলস্টেশনে হাজিরা দিতে শুরু করি। হাতে কাজ নেই, বেড়াতে বেড়াতে চলে যাই ট্রেন দেখতে। ছেলেবেলা থেকে রেলগাড়ীর উপর আমার অহেতুক একটা টান আছে। রেলগাড়ী দেখলে আমি যাত্রাসুখ অনুভব করি। বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে আসতে বা দিয়ে আসতে রেলস্টেশনে যাওয়া আমার কাছে চিরদিন সমান চাঞ্চল্যকর। বলতে যাচ্ছিলুম রোমাঞ্চকর, কিন্তু ওটা হাতে রাখতে চাই জাহাজের জন্যে।

ট্রেন দেখতে যাবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। কে জানে হয়তো কোনো চেনা মুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। নয়তো কোনো অচেনা মুখের সঙ্গে আলাপ জমে উঠবে। কিন্তু ট্রেন দাঁড়ায় মাত্র দু'মিনিট। চেনা মুখ নজরে পড়ে না। অচেনার সঙ্গে পরিচয় হয় না। ফিরে আসি শূন্য মনে। কিন্তু সেই যে বলেছি, রেলগাড়ীর উপর আমার অহেতুক একটা টান আছে। ট্রেন আসছে, থামছে, চলছে, চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার শূন্য মনকে পূর্ণ করে দেয় অপরূপ উত্তেজনায়। উত্তেজনা কেবল দৃশ্যের জন্যে নয়, শব্দের জন্যেও।

চলতে থাকা রেলগাড়ীর ঝক্-ঝক্-ঝক্ আওয়াজ আমার কানে অদ্ভুত ভালো লাগে। সেইজন্যে বারবার যাই।

একদিন নামলেন এক বিশালকায় ভদ্রলোক, সঙ্গে বিস্তর লটবহর। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে গেলেন স্থানীয় দু-একজন ভদ্রলোক, তাঁদের একজনের নাম পরিতোষবাবু। আমি অবাক হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছি, ভাবছি ইনি কোনো আমীর ব্যক্তি হবেন। এমন সময় অন্য এক কামরা থেকে ব্যাগ হাতে করে নামলেন এক কৃশকায় ভদ্রলোক। মুখখানা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। চোখ দুটো উজ্জ্বল। এঁর উপর দৃষ্টি পড়ার পর আমি কতকটা আনমনা ভাবে এঁর দিকে এগিয়ে যেতে থাকলুম। আগে কখনো দেখা হয়নি, অথচ মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি।

"আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই," বললেন পরিতোষবাবু। আমাকে নিয়ে গেলেন বিশালকায়ের সকাশে, তিনি গাইবাঁধার কুমার বিভূতিনারায়ণ। কৃশকায়কে নিয়ে এলেন আমার সমীপে, ইনি তাঁর ম্যানেজার প্রিয়দর্শন ভদ্র। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তাই হলো। জমিদার আমার সাহিত্যিক পরিচয় উপেক্ষা করে সরকারী পরিচয় শুনে গদগদ হলেন। কিন্তু তাঁর ম্যানেজার আমার সরকারী পরিচয় উপেক্ষা করে আমার সাহিত্যিক পরিচয়ের সমাদর করলেন।

আমার দুই হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরে অনেকক্ষণ নির্বাক থেকে প্রিয়দর্শনবাবু বললেন, "অবশেষে!"

আমিও বললুম, "অবশেষে!"

আমাদের দু'জনের এই সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝতে পারে তেমন লোক সেখানে ছিল না। জমিদার তো মোটরে গিয়ে উঠলেন। পরিতোষ-বাবুরাও লটবহরের সঙ্গে চললেন। প্ল্যাটফর্মে কেবল প্রিয়দর্শন ও আমি।

"আপনি আমাকে লণ্ডন থেকে যে চিঠি লিখেছিলেন মনে আছে?"

"মনে আছে।"

"তার পরে আট নয় বছর কেটে গেছে, কিন্তু প্রত্যেকটি লাইন আমার মুখস্থ। শুনবেন, বলব?" প্রিয়দর্শন আমাকে চমৎকৃত করে দিলেন।

"আপনার প্রত্যেকটি বই আমি পড়েছি। কিন্তু একথা থাক। এখানে ক'দিন আছেন বলুন। এই সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুটিমাত্র অমৃত ফল। কাব্যাস্বাদন আর সজ্জনসঙ্গ।"

প্রিয়দর্শন ভদ্র আমার বাল্যকালের প্রিয় লেখক। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড। আমাকে যখন কেউ চেনে না তাঁর তখন দেশজোড়া নাম। একদিন সেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চিঠি লিখে আমার রচনার জন্যে অভিনন্দন জানালেন। বললেন তিনি সারা জীবন যা লিখতে চান, লিখতে পারছেন না, আমি প্রথম চেষ্টায় তাই লিখে তাঁকে ভারমুক্ত করেছি। এব পরে তাঁর আর কিছু লেখবার রইল না। আমি তখন লণ্ডনে। চিঠির উত্তরে আমার বাল্যকালের ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলুম। বললুম, দেশ তাঁর কাছে অনেক আশা করে। আমার সাধ্য নেই যে দেশের সে আশা আমি পূরণ করি। অতএব তাঁকে লিখতেই হবে।

তার পরে সত্যি তিনি আর বিশেষ কিছু লেখেননি। আমি চিঠি লিখে অনুযোগ জানিয়েছি। দেখাসাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি যোগাযোগের অভাবে। পত্রালাপ বন্ধ হয়েছে সময়ের অভাবে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলন হলো সাঁওতালদের দেশে।

তাঁর জন্যে মোটরখানা ফিরে আসবে কথা ছিল। আমরা ততক্ষণ স্টেশনে পায়চারি করতে করতে কথাবার্তা চালালুম। তিনি বার বার আমার হাত টেনে নিয়ে বন্দী করতে লাগলেন। আবার হাত ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছতে থাকলেন।

"ভবভূতির সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে ?"

"কোন্‌টি ?"

"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী। আমি ভাগ্যবান যে আমার সমানধর্মার জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে হলো না।"

ছেলেবেলায় প্রিয়দর্শনের প্রতিকৃতি দেখেছিলুম "ভারতী"তে। দেখে মনে হয়েছিল সার্থকনামা। বিশ বছর কেটে গেছে। সে স্বাস্থ্য, সে রূপ, সে সহাস ভাব আর নেই। গাল দুটো চোপসা, কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে, চামড়াটা রুক্ষ, চুলগুলো কাঁচাপাকা ও পাতলা। অনেক দুঃখ-পাওয়া, অনেক পোড়-খাওয়া বিদগ্ধ জনের মতো চেহারা। তবে গড়নটি ছিপছিপে লম্বা। তীরের মতো সোজা। যৌবনের আমেজ আছে চাউনিতে, চলনে। পরনের ধুতি, পিরান ও চাদর ধবধবে তকতকে।

সেদিন তাঁকে মোটরে তুলে দিয়ে বিদায় নেবার সময় বললুম, আবার দেখা হবে। ইচ্ছা ছিল তাঁদের ওখানে যাব, কিন্তু তিনি নিজে এসে উপস্থিত হলেন।

"কুমার বাহাদুর মানুষ মন্দ নয়। কিন্তু সাহিত্যের একবিন্দু বোঝেন না। আপনি যে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এর জন্যে আপনার এক কানাকড়ির মর্যাদা নেই তাঁর কাছে। আমারও নেই। যেদিন তিনি শুনলেন আমি একজন কবি, ঠাওরালেন আমি কবিওয়ালা। কবির গান শুনবেন বলে আবদার ধরলেন। সে এক সংকট।"

"তারপর সংকট মোচন হলো কী করে ?"

"হলো কী করে ?" তিনি একটু হাসতে চেষ্টা করলেন। "আমাদের মা-লক্ষ্মীরা না থাকলে আমাদের চিনত ক'জন ? যদি খবর নেন শুনবেন তাঁরাই আপনার বই সব চেয়ে বেশি পড়েন। আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফলে কুমার বাহাদুরের অন্তঃপুরিকারা আমাকে চিনতেন। আমার দু-একখানা বইও ছিল তাঁদের গ্রন্থাগারে। তা ছাড়া ছিল বাঁধানো মাসিক পত্র।

ছবিও ছিল তাতে। কুমারকে বোঝানো গেল—কবি, যে কবিতা লেখে। যেমন জল পড়ে পাতা নড়ে। যেমন মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

আমি হেসে আকুল হলুম।

"কিন্তু বিপদে পড়ি যখন মা-লক্ষ্মীরা বলেন, আমরাও কবিতা লিখি, আমাদের কবিতা কেন মাসিকপত্রে ছাপা হয় না তার প্রতিকার করুন। তখন খোদার উপর খোদকারি করতে হয়। সংশোধন করতে বসে খোল আর নলচে বদলে দিই। ছাপা হয় তাঁদের নামে। এমনি করে চাকরি বজায় রাখি। জমিদারির কাজ হাজার ভালো জানলেও চাকরি থাকে না। ম্যানেজার মানে জমিদারির ম্যানেজার নয়, জমিদারের ম্যানেজার তথা তাঁর পরিবারের।"

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে নীরব রইলুম।

"আচ্ছা, ম্যানেজার হয়েছি বলে কি সব কিছু ম্যানেজ করতে হবে আমাকে? পারে কখনো কেউ? কিন্তু অনেকের ধারণা আমি পারি। এমন ঘটনা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন বার নয়, চার-চার বার আমার জীবনে ঘটেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিতা মহিলা এসে আমার সাহায্য চেয়েছেন। অর্থ সাহায্য নয়, তা হলে বেঁচে যেতুম।"

আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে সাহস হচ্ছিল না। শুনে যাচ্ছিলুম।

"ভেবে দেখুন, মিস্টার রায়, কেউ যদি আপনার কাছে এসে বলে, 'আমি শরণাগত,' তা হলে আপনি কেমন বোধ করেন? শরণাগতকে শরণ দিতে হবে, এটা হলো আমাদের দেশের ঐতিহ্য। কিন্তু যার বিরুদ্ধে শরণ দিতে হবে সে যদি হয় প্রবলপ্রতাপ শত্রু, তা হলে কি পারবেন শরণ দিতে! দিলে চাকরি থাকবে!"

কী উত্তর দেব? আমি হলে কি পারতুম শরণ দিতে?

"বার বার চাকরি হারাতে হলো। অভাবে পড়লুম। ভাগ্যিস বিয়ে করিনি। তা হলেও বাঙালীর সংসারে পোষ্যের কমতি নেই। তাদের নিয়ে অকূলে ভাসতে হলো। কেন লেখা বন্ধ করে দিলুম জানতে চেয়েছিলেন। লেখা বন্ধ করব কি, লেখা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। লেখা থেকে যাঁদের দু'পয়সা হয় তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু আমার তো লোকসানের কারবার। লিখেছি, লিখে নিজের খরচে ছাপিয়েছি। নয়তো বিলিয়ে দিয়েছি। লিখতে আমার এত ভালো লাগে। যখন লিখি তখন এত আনন্দ পাই। মনে হয় আমি দেবতা, আমি স্রষ্টা, আমি নিজের জগৎ নিজে সৃষ্টি করছি। কিন্তু গত দশ-বারো বছরে আমি একটি কবিতাও লিখে শেষ করতে পারিনি। বোধ হয় একেবারে নিবে গেছি।"

"না, না।" আমি আশ্বাস দিলুম। "নিবে যাবেন কেন। আপনি লিখবেন আবার। আরো ভালো লিখবেন। ফরাসী কবি ভালেরি বিশ বছর লেখা বন্ধ রেখেছিলেন। আবার যখন লিখলেন তখন সুন্দর কবিতা এলো।"

"কাব্যলক্ষ্মী অভিমানিনী। একবার অবহেলা করলে চিরতরে চলে যান। আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভাই অন্নদাশঙ্কর।" এবার তিনি অন্তরঙ্গের মতো বললেন।

"তবে জীবনকে ফাঁকি দিইনি। ডাক শুনে সাড়া দিয়েছি। চ্যালেঞ্জ করেছে, পাঞ্জা কষেছি। দয়া করেনি, ভেঙে পড়িনি। এখনো আমি বনস্পতির মতো খাড়া রয়েছি।"

সে কথা ঠিক। আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম, বললুম, "কবিত্বের চেয়ে জীবন বড়। জীবন যদি খাঁটি হয় তো কবিতা তার থেকে ঝরবে। জীবনের যত্ন নিন, কবিতা আপনি আপনার যত্ন নেবে।"

প্রিয়দর্শন কিছুক্ষণ চুপ করে কী ভাবলেন। তারপর বললেন,

"শুনলেন তো আমার অবস্থা। এবার আপনার কথা বলুন। নতুন কিছু লিখছেন?"

"কবিতা লেখা প্রায় বন্ধ। নভেল লিখছি, কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের পর আর এগোতে পারছিনে। দম ফুরিয়ে এসেছে। শরীর ভালো নেই, মন খারাপ।"

"অত খাটলে শরীর ভালো থাকে কখনো? কিন্তু মন খারাপ বললেন। জানতে পারি, কেন?"

"মন খারাপ অনেক দিন থেকে! দেশ স্বাধীন হয়নি, তার জন্যে যা করা উচিত তা করা হচ্ছে না। আমি নিজে বিপক্ষের শিবিরে। গ্লানি দিন দিন বাড়ছে। ছাড়ব ছাড়ব করে ছাড়তে পারছিনে চাকরি। নিজের উপর বিশ্বাস কমে যাচ্ছে। তবু যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকত। তাও হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমার সম্বল মানুষে বিশ্বাস। কিন্তু আবিসিনিয়াব যুদ্ধের আলোয় মানুষের যে চেহারা দেখলুম তা আমাকে হতাশ করেছে। সত্যি কি এরা কেউ ন্যায়ের জন্যে অস্ত্র ধরবে!"

প্রিয়দর্শন সহানুভূতির সুরে বললেন, "মন খারাপির কারণ আছে মানি। তবু আপনাকে নিজের কাজে মন দিতে অনুরোধ করি। সাহিত্যের কাজ যারা করবে তারা যদি দুনিয়ার কথা ভেবে মন খারাপ করে তা হলে দুনিয়ার কী লাভ জানিনে, কিন্তু সাহিত্যের দুর্দিন।"

"সাহিত্যিকরা," আমি হেসে বললুম, "আপনার সঙ্গে একমত হবেন না। ইংলণ্ডের জনকয়েক তরুণ লেখক স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে অসি ধরেছেন। মসী এখন শিকেয় তোলা"।

"আমি কিন্তু এত খবর রাখিনে, রাখতে চাইনে। হাতের কাছে যা দেখি তাতে হাত দিই। হাতের কাজ শেষ করে তার পবে অন্য কথা। সমষ্টির দুঃখের চেয়ে ব্যক্তির দুঃখই আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দেশের জন্যে ভাববার লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু একটি বিপন্ন মেয়ে একা লড়াই করছে তার স্বামী নামক দৈত্যের সঙ্গে। তার কথা

ভাববার জন্যে কেউ নেই। আমাকে দাদা বলে ডেকেছে। আমাকেই ভাবতে হয়।"

আমি আবার কৌতূহলের সঙ্গে শুনি।

"আমি যেন একটা চুম্বক। যেখানে যত দুঃখিনী কাছে আমি তাদের আকর্ষণ করি আমার কাছে। চিনিনে, জানিনে, চাইনে, তবু তাদের টানি। কেউ বলে দাদা, কেউ বলে ভাই, মিতা পাতায় কেউ। প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যে সংগ্রাম করতে হয় তাদের, সে সংগ্রামে আমি তাদের দোসর। আমি বল জোগাই, নইলে তারা হার মানত, আত্মসমর্পণ করত। তা হলে সেটা হতো সত্যিকারের ট্রাজেডী। মরণকে আমি ট্র্যাজেডী বলিনে। দুঃখবরণকে তো নয়ই।"

"এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার এত মনের জোর নেই যে মৃত্যু দেখলে অভিভূত হব না। মৃত্যু কেন, যে কোনো দুঃখ দেখলে আমি দ্রবীভূত হই।"

"সেটা কবিধর্ম। কবির হৃদয় স্বভাবত কোমল। নতুবা সে কবি হতো না, আর কিছু হতো। কিন্তু এইসব দুঃখিনীদের সংস্পর্শে এসে এদের সংগ্রামের শরিক হয়ে আমার হৃদয় ক্রমে ক্রমে কঠিন হয়ে উঠেছে। কবিতা লিখতে না পারার সেটাও একটা কারণ।"

চা খেয়ে আমরা চললুম সাঁওতাল পল্লী আবিষ্কার করতে। মাঠের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হলো। এক এক জায়গায় জল জমেছিল। লাফাতে হলো। প্রিয়দর্শনবাবু উৎসাহের সঙ্গে লম্ফ দিলেন। বললেন, "এখনো বুড়ো হইনি। তার দেরি আছে।"

"বুড়িয়ে যাবেন এই বয়সে! এখনো পঞ্চাশ পেরোয় নি।"

"পঞ্চাশ দূরের কথা। পঁয়তাল্লিশ পার হয় নি।"

"তা হলে আপনার এ দশা কেন?"

"সে কথা যদি জানতে চান তো অনেক কথা বলতে হয়। রীতিমতো

নভেল। কিন্তু দোহাই আপনার, এসব কথা লিখবেন না, আমি যত দিন বেঁচে আছি।"

"আচ্ছা, তা হলে লিখব না। কথা দিচ্ছি। আপনিও কথা দিন যে আরো পঁচিশ বছর বাঁচবেন।"

"পঁ-চি-শ বছর!" তিনি অবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন। "তত দিন আমার পরমায়ু থাকলে তো। জোর দশ-বারো বছর।"

এই অলক্ষুণে বিষয়ে আর বাক্যালাপ করলুম না। সাঁওতালদের পল্লীর কাছে এসে পড়েছিলুম। কী সুন্দর তাদের কুটিরগুলি! এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি যে দালানকেও লজ্জা দেয়। ইচ্ছা করে তাদের সঙ্গে বাস করতে। প্রিয়দর্শনবাবুরও সেই ইচ্ছা।

"শেষ জীবনটা এইখানেই কাটিয়ে দেব ভাবছি। এরা যদি আমাকে থাকতে দেয়। চেহারাটাও তো ক্রমে এদেরি মতো হয়ে আসছে। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি দিব্যি গৌরবরণ ছিলুম। এবার এদের ভাষা শিখতে হবে।"

এই বলে তিনি একজনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বাংলা থেকে হিন্দী, হিন্দী থেকে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো দুটো একটা সাঁওতালী শব্দ। তাঁর একজন শিক্ষকও জুটে গেল। কিছু টাকা তিনি খয়রাত করলেন সাঁওতালদের দেবতার জন্যে। একেই বলে ম্যানেজার।

ফেরবার পথে প্রিয়দর্শন বললেন, "জমিদারবাড়ীতে কাজ করতে করতে আমার একটু অভ্যাসদোষ ঘটেছে। সাঁওতালদের সঙ্গে আমার বনবে ভালো। কিন্তু আপনার সঙ্গে বনবে না। আপনার ও দোষ নেই।"

"কী করে জানলেন?"

"আমি মানুষ চিনি। বলতে গেলে মানুষ চেনা তো আমার পেশা। তাই করেই তো খাচ্ছি। কবিতা লিখে এ দেশে পেটের ভাত জোটে না।"

বিদায় নেবার সময় বললেন, "আমার সম্বন্ধে আপনাকে আমি সতর্ক করে দিই। আপনি যাকে দেখছেন সে সাহিত্যিক প্রিয়দর্শন। চাঁদের উলটো পিঠের মতো আর একজন প্রিয়দর্শন আছে, সে ম্যানেজার প্রিয়দর্শন। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কথায় বলে, যেমন দেবা তেমনি দেবী। যেমন রাজা তেমনি উজির। যেমন জমিদার তেমনি ম্যানেজার। আমার প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে আপনার যেটুকু আলাপ হয়েছে সেইটুকু যথেষ্ট। যদি কোনো দিন রংপুর জেলায় বদলি হন তাঁর সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু হবে না। তখন তাঁর ম্যানেজারের সম্বন্ধেও আপনার ধারণা নেমে যাবে। কাজ কি চাঁদের উলটো পিঠ দেখে! আপনাকে আমার অনুনয়, আপনি আমার প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন না। তবে তিনি যদি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেন তা হলে অবশ্য আসা উচিত।"

জমিদারের ম্যানেজার যাঁরা হন তাঁদের সাধারণত কয়েক রকম সদ্‌গুণ থাকে। প্রিয়দর্শন জানতেন যে, একদিন না একদিন সে সব আমার চোখে পড়বে কানে আসবে। সেইজন্যে আগে থেকে আমার মনটাকে মোহমুক্ত করে রাখলেন। এর প্রয়োজন ছিল। আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুতা যাতে সাহিত্যক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তার জন্যে তিনি ও আমি দু'জনেই যত্নবান ছিলুম। যে কয়দিন আমরা একত্র হয়েছি, বেড়াতে গেছি, গল্প করেছি, সাহিত্যের বিষয় ভিন্ন আর কোনো বিষয়ে কালক্ষেপ করিনি। তাঁর সঙ্গে কোনো জমিদারী পাইক বা বরকন্দাজ আসত না। তাঁর মালিক আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি, আমি তাঁর ওখানে যাইনি। ভদ্রলোক নাকি সব সময় অসুস্থ ছিলেন।

"আমি বেশ বুঝতে পারছি," এক দিন তিনি বললেন, "আমার ভিতরে ভাঙন ধরেছে। বাইরের ভাঙন তার প্রতিরূপ। আয়নার দিকে তাকাতে ভালো লাগে না। ভালো লাগে আপনার দিকে তাকাতে।

আপনি আমার আয়না। আপনার চোখে আমার যে রূপ দেখতে পাই সে রূপ নিত্যকালের প্রিয়দর্শনের। কবি প্রিয়দর্শনের। বেঁচে থাক সেই সত্যিকারের প্রিয়দর্শন। মরে যাক এই বৃদ্ধ ব্যর্থ বন্ধ্যা প্রিয়দর্শন।"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ছি ছি। ও কী বলছেন আপনি! বাঁচতে হবে আপনাকে বাংলা সাহিত্যের মুখ চেয়ে। লিখতে হবে আপনাকে আপনার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভাঙন যদি ধরে থাকে তবে তা রোধ করতে হবে, লড়তে হবে তার সঙ্গে। কেন তার কাছে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন? এই তো সেদিন বলছিলেন যে আত্মসমর্পণ হচ্ছে ট্র্যাজেডী।"

"একশো বার। কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে দেখাও তো কম দুঃখের নয়। নিজেকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু পরকে বাঁচাতে না পারাও তো ব্যর্থতার বেদনায় ভরপূর।"

জানতে ইচ্ছা করছিল কী বৃত্তান্ত, কিন্তু আগ্রহটা অশোভন হতো।

"আমার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ," তিনি বলতে লাগলেন, "আমার জীবনের দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সে গ্রন্থ লেখা হয়ে গেছে আমার সত্তার পরতে পরতে, আমার মনের আনাচে কানাচে, আমার শরীরের শিরায় শিরায়, রোমকূপে রোমকূপে, আমার চেহারায়, আমার চোখে। ক্ষমতা থাকলে তাকে আমি অনুবাদ করতুম মুখের ভাষায়, লেখনীর মুখের ভাষায়। অনুশীলনের অভাবে ক্ষমতা যেটুকু ছিল সেটুকুও হারিয়েছি। ফিরে পাবার কথা ভাবতেও ভুলে গেছি। এখানে হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কেউ কোনো দিন ও কথা আমাকে মনে করিয়ে দিত না। আমি কবে একজন কবি ছিলুম, মরে ম্যানেজার হয়ে গেছি। আমার এটা সূক্ষ্ম শরীর।"

"আপনার দুর্লভ অভিজ্ঞতা আপনার সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাবে। দেশ

তার অংশ পাবে না। ভাবতে কষ্ট হয়, প্রিয়দর্শনদা।" আমি আফসোস জানালুম।

দাদা ডাক শুনে তিনি গলে গেলেন। বললেন, "তুমি আমার সমানধর্মা। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেই দিন থেকে মনে করেছি তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে যাব আমার অভিজ্ঞতার অলিখিত পুঁথি। তুমি এক দিন লিখবে। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়। অবশ্য তোমার যদি লিখতে ইচ্ছা না করে লিখবে না। লিখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।"

তাঁর চোখে জল এসে গেছল। গলার স্বর ভারী। আমি বললুম, "দাদা, আপনি লিখলে যেমনটি হবে আমি লিখলে তেমনটি হবে না। কাজেই আপনি নিজের হাতে আরম্ভ করে দিন। আপনি এখনো অনেক দিন বাঁচবেন। তবে আমাকে শোনাতে চান শোনান। আমি মনে রাখব। আপনি যদি না লেখেন আমি লিখব। আপনার জীবনকালে নয়, কথা দিচ্ছি।"

তিনি নীরবে চোখের জল ঝরালেন। তার পর আমার দুই হাত নিজের দুই হাতে চেপে ধরলেন। কবিতে কবিতে ভাব সম্মেলন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

(২)

প্রিয়দর্শনদার ঐ এক দোষ। অতি সহজে অভিভূত হন। চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না। কথা বলেন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। বলতে বলতে থেমে যান।

কিছু দিন থেকে কাগজে কাগজে কানাঘুষা চলছিল স্বয়ং সম্রাটকে কেন্দ্র করে। এমন মুখরোচক গুজব বহুকাল শোনা যায়নি। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই প্রশ্ন করে, "এর পরিণাম কী হবে বলে মনে হয়?" উত্তর দিতে পারিনে।

একদিন দেখি প্রিয়দর্শনদা ছুটে আসছেন কাগজ হাতে করে—তখনো আমার কাগজ এসে পৌঁছয়নি। কাগজখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। চোখে জল থই থই করছে। কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর নয়।

এডওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করেছেন।

রেডিওতে তাঁর বিদায় ভাষণ দেবার আগে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। তাতে তাঁরা রাগ করেছেন। মানুষ এডওয়ার্ড মানুষের কাছে হৃদয় খুলেছেন। তাঁর হৃদয়ের ব্যথা সকলের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে। তিনি লেখক নন, বক্তা নন। কিন্তু যে করুণ রসের অবতারণা করেছেন তা মর্মভেদী।

অনেকক্ষণ লাগল কাগজখানা উলটে পালটে পড়তে। ততক্ষণ প্রিয়-দর্শনদা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করছিলেন। আমিও যেমন, তাঁকে সিগরেট দেখাতে ভুলে গেছি। আমারও বাহ্যজ্ঞান ছিল না।

কাগজ পড়া হয়ে গেলে একপাশে সরিয়ে রাখলুম। বললুম, "তার পর?"

"তার পর!" তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "তারপর আর কী! অযোধ্যার মূঢ় প্রজা তাদের রানীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংলণ্ডের মূঢ় প্রজা দিল রাজাকে তাড়িয়ে। আধুনিক যুগ, আধুনিক যুগ বলে গর্ব করো। কোথায় তোমার আধুনিকতা? সেই সনাতন মূঢ়তা। পাঁচ হাজার বছরে উন্নতি এইটুকু হয়েছে যে, রাজা এবার সিংহাসনের চেয়ে রানীকেই মূল্যবান বলে জেনেছেন। নারীর মূল্য বেড়েছে। সেইজন্যে আমি মনে মনে খুশি।"

খুশির লক্ষণ অবশ্য দেখলুম না। বললুম, "এর কিন্তু একটা ট্র্যাজিক দিক আছে, প্রিয়দর্শনদা। সাম্রাজ্যই বলুন, জমিদারীই বলুন, ম্যানেজারিই বলুন, এমন কি পিয়নিই বলুন, এক কথায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। পুরুষের জীবনে পুরুষোচিত বৃত্তি কেবল ভাত কাপড়ের ব্যাপার নয়। সমাজের আর দশ জন পুরুষের সঙ্গে তুলনা করলে মনটা দমে যায়। তাদের সঙ্গে খাপও খায় না। এর পরে আসছে ছন্নছাড়া খাপছাড়া জীবন। সিংহাসন তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে গেল পুরুষযোগ্য ভবিষ্যৎ।"

"তুমি যা বললে তা ঠিক।" প্রিয়দা একটু চাঙ্গা হয়ে বললেন। সিগরেট চেয়ে নিলেন। "কিন্তু আমি যা বলছি তাও বেঠিক নয়। আচ্ছা, তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ। বলতে পারো ইতিহাসে আর কোনো রাজা নারীর জন্যে রাজ্যপণ করেছেন?"

"মনে তো পড়ে না।" আমি চিন্তা করে বললুম।

"তা হলে ভেবে দেখ, নারীর মূল্য কতোখানি বাড়ল।" তিনি কাগজখানা ভাঁজ করে সযত্নে তুলে রাখলেন। তাঁর চোখে আনন্দের আমেজ।

"দাদা কি তা হলে ফেমিনিস্ট?"

"না, ভাই। আমি তোমার আধুনিক যুগের ফেমিনিস্ট নই। আমি," তিনি একটু ইতস্তত করে নম্রভাবে বললেন, "মধ্যযুগের নাইট।"

নাইট। আমি আশ্চর্য হলুম। মধ্যযুগের নাইট!

"আশ্চর্য হচ্ছ! কোন্‌টা শুনে আশ্চর্য হচ্ছ? নাইট শুনে, না মধ্য-যুগের শুনে?"

"কী জানি ঠিক বুঝতে পারছিনে।" আমি চিন্তান্বিত হয়েছিলুম। আধুনিক বলে সত্যি আমার একটু গর্ব ছিল। আর নাইট তো একটা অর্থহীন খেতাব।

প্রিয়দর্শনদা উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, "শিভ্যালরির যুগ এখনো অতীত হয়নি। এখনো নারীর জন্যে পুরুষ আত্মত্যাগ করে। অনেক স্থলে হয়তো সে নারী তার প্রেমিকা নয়, তার কেউ নয়। তা হলেও সে নারী। সে মহিলা। তার জন্যে বিপদ বরণ করতে প্রতিদিন প্রস্তুত থাকাই তো নাইটের জীবনব্রত। ডাক শুনলে যে পুরুষ সাড়া দেয় সে-ই তো নাইট। পুরুষোচিত বৃত্তির কথা ভেবে যে অসাড় থাকে সে কি পুরুষ।"

বুঝতে পারলুম প্রিয়দা তাঁর নিজের সম্বন্ধে আভাস দিলেন। শুনতে ইচ্ছা ছিল তার গল্প। কিন্তু হাতে কাজ ছিল।

প্রিয়দাও গল্পের জন্যে তৈরি ছিলেন না। বললেন, "একটা কবিতা লিখতে চাই। এত বড় একটা ঘটনা এ জীবনে দ্বিতীয় বার ঘটবে না। ইতিহাসে ঘটে কি না সন্দেহ। হে সম্রাট, হে সম্রাট-কবি। ··· নাঃ। রবিবাবুর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিনে। হে কুমার, হে রাজকুমার ·· "

কবিতা লেখার জন্যে কাগজ-কলম এগিয়ে দিলুম। তিনি লিখতে বসলেন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর দাদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "ও আমাকে ছেড়ে গেছে। আর ফিরবে না।"

জানতে চাইলুম, "কে ?"

"কবিতা।"

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন। "স্তোকবাক্য শুনিয়ে কী হবে! তুমি কি পারবে দূর করতে আমার এ দুঃখ! দরদীরা বলে, আপনি গল্প লেখেন না কেন, নভেল লেখেন না কেন ? আরে, গল্প লিখে কি কবিতা লেখার সুখ পাওয়া যায় ? কবিতা লেখা যেন উত্তমা নায়িকার সঙ্গলাভ। আর উপন্যাস লেখা যেন—থাক, আর বললুম না। তুমি উপন্যাস লেখ কিনা।"

আমি হাসির ভাণ করলুম। কথাগুলো হুল ফোটাচ্ছিল। কিন্তু অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়।

"তা বলে আপনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন এ কেমন কথা।" আমি আক্ষেপ জানালুম।

"আমি কি ছাড়তে চাই ? ও-ই তো ছেড়ে গেছে। নইলে এত বড় একটা উপলক্ষ গীতিবদ্ধ হয় না! এই বা কেমন কথা!"

"দু'দিন সবুর করুন। কবিতা আপনি আসবে। ওর উপর জোর খাটানো ঠিক নয়। উপলক্ষ তো একদিনেই বাসি হচ্ছে না।"

"এ তো মহাকাব্য নয়। এ হলো লিরিক। এ যদি আজ না আসে তো কাল আসবে না। কাল কি আমার অনুভূতি এমনি নিবিড় থাকবে, মনে করো ?"

"সে কথা ঠিক। প্রিয়দর্শনদা হতাশ হয়ে কাগজ-কলম সরিয়ে রাখলেন। বললেন, "তোমার যখন কবিতা আসে না তখন উপন্যাস আসে, যখন উপন্যাস আসে না তখন প্রবন্ধ আসে। আমার তো দ্বিতীয়া তৃতীয়া নেই। আমার ঐ একমাত্র প্রিয়া। ও আর ফিরে আসবে না। নইলে এমন দিনে ওর দেখা পেতুম না ?"

বুঝতে পারলুম তাঁর কিসের দুঃখ। এ বেদনা আমিও মাঝে মাঝে অনুভব করি। কিন্তু অতখানি নয়। এর কোনো উপায় নেই। অপেক্ষা করতে হয়। আশা রাখতে হয়। তার মানে, অনেক দিন বাঁচতে হয়। কিন্তু যার আয়ু ফুরিয়ে আসছে তাকে ও কথা বললে কি স্তোকবাক্যের মতো শোনাবে না?

আমাকে নীরব দেখে তিনি আপনা থেকে বললেন, "থাক, মন খারাপ কোরো না। একদিন এ দশা তোমারও হতে পারে। এটা কবিদের নিয়তি।"

তা শুনে আমার আরো মন খারাপ হলো। আমারও তো কত কথা বলবার আছে, তার কতক বলা হবে কবিতায়, কতক উপন্যাসে ও ছোটগল্পে, কতক প্রবন্ধে ও ভাষণে, কতক হয়তো নাটিকায়। এক দিন যদি দেখি যে কোনোটাই আমার আসছে না, আমি প্রিয়দর্শনদার মতো অসহায়, তখন?

দু'জনের জন্য দু'পেয়ালা কফি এলো। শীত পড়েছে। দিনের বেলাও কফি চলে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে তিনি বললেন, "তুমি যা ভাবছ তা আমি আন্দাজ করেছি। তোমার যখন আমার বয়স ও আমার দশা হবে তখন তুমি কী করবে? কেমন, এই তো? ঠিক ধরেছি আমি।"

আমি লজ্জায় নিরুত্তর রইলুম।

"কিন্তু তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। তোমার তো কেবল কবিতা নয়, তোমার তূণে অনেক রকম বাণ। এমন দশা তোমার কোনো দিন হবে না। কিন্তু তুমিও তো মানুষ। তোমারও যৌবন চিরদিন থাকবে না। দেখবে, সেইটেই সব চেয়ে দুঃখের।"

আমার বয়স তখন কত? বত্রিশ তেত্রিশ। কবে যৌবন যাবে

তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না। ভাবনা শুধু কবিতার জন্যে। কবিতা ইতিমধ্যেই দুর্লভ হয়েছিল।

দাদা বললেন, "ওঃ! এর কি কোনো তুলনা আছে! এই দুঃখের! এই যে আমার যৌবন চলে যাচ্ছে, অথচ সৃষ্টি হচ্ছে না, এ যেন দু'দিক থেকে পুড়ছে আমার মোমবাতি। তবু যদি যৌবনটা থাকত। প্রতি দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবি, প্রকৃতি যেমন ষোড়শী ছিল তেমনি আছে। আমি শুধু দিন দিন প্রবীণ হচ্ছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমাকে আর মানাবে কেন।"

তিনি উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকালেন। সব নতুন, চির নতুন। তিনিই শুধু পুরাতন। বললেন, "প্রত্যহ আমার মনে হয়, চলে যাচ্ছে। যৌবন চলে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে। যৌবন সরে যাচ্ছে। আমি যেন কূলে দাঁড়িয়ে। নৌকা ছেড়ে যাচ্ছে। লালাবাবুর মতো আমারও কানে বাজে, কে যেন বলছে, 'দিন তো গেল!"

আমি এ প্রসঙ্গের প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছুক নই। বলি, "আপনি লিখলেই ভালো হতো, তা যখন পারছেন না, আমাকে বলুন, আমি একদিন লিখব। শুনি আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা।"

"সত্যি। তুমি শুনবে?" তিনি যেন ভাসতে ভাসতে অবলম্বন পান। তাঁর মুখ ভরে যায় আনন্দের আভায়। চোখ ছল ছল করে খুশিতে।

এমনি করে সূত্রপাত হলো যে-কাহিনীর তা বোনা হলো দিনের পর দিন ধীর মন্থরভাবে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের মতো। কখনো আমার বাসায়, কখনো সাঁওতাল পল্লীর পথে, কখনো রেল স্টেশনে, কখনো রেল লাইনের ওপারে গোরুর গাড়ীর রাস্তায়। সাধারণত সন্ধ্যায়, কোনো কোনো দিন সকালে, ক্বচিৎ দুপুরে।

"একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখতে চাই," সেদিন তিনি গৌরচন্দ্রিকা করলেন, "এ কাহিনী আমার জীবনের কাহিনী নয়। কবিরা

আত্মকাহিনী লেখেন না, তাঁদের কাব্যই তাঁদের আত্মকাহিনী। আমি আমার গল্প শোনাতে চাইনে, শোনাতে চাই তাদের গল্প যারা কবি নয়, লেখিকা নয়, যাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তাদের কাহিনীর সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে বলেই নিজের সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা দরকার। নয়তো এসব কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হবে না। লোকে মনে করবে বানানো। তুমি কী মনে করবে জানিনে। হয়তো ভাববে এসব কবিকল্পনা।"

আমি বললুম, "নিজের সম্বন্ধে দু-চার কথা কেন, যা মনে আসছে বলে যান। নিজেকে বাদ দিয়ে গল্প বলতে গেলে সে-গল্প অকৃত্রিম হয় না। এমন কি বানানো গল্পকেও অকৃত্রিম বলে চালাতে হলে 'আমি'র জবানীতে বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প 'আমি'র মাধ্যমে বলা। গল্প জিনিসটাই একটা কন্‌ফিডেন্স ট্রিক। বিশ্বাসের খেলা। কেউ যদি বিশ্বাস না করে তো গল্প উৎরায় না। যাতে সকলে বিশ্বাস করে তার জন্যে যা-কিছু করা দরকার, সমস্ত করতে হবে।"

দাদা হেসে বললেন, "জমিদারী চালিয়ে খাই। আদালতের জন্যে মিথ্যা সাক্ষী শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠাই। কী করি, বলো। ওটা আমার পেশা। তা বলে দেবী সরস্বতীর দরবারে মিথ্যা সাক্ষী দেব? অসম্ভব। সেইজন্যেই আমার হাত দিয়ে নভেল হলো না। কত লোক নভেল লিখে করে খাচ্ছে। তার সাড়ে পনেরো আনাই মিথ্যে।"

"জীবনের দিক থেকে যা মিথ্যা আর্টের দিক থেকে তা সত্য হতে পারে, প্রিয়দা। অবশ্য সব-সময় তা নয়।"

"হাঁ, বড় বড় মিথ্যাবাদীর ঐ একই সাফাই। আর্টের দিক থেকে সত্য!" তিনি উষ্মার সঙ্গে বললেন। "কোনো বড় কবি কোনো কালে মিথ্যা কথা বলেছেন? হোমর বাল্মীকি মিথ্যার ফাঁদ পেতেছেন? কবিদের যে লোকে শ্রদ্ধা করে তার কারণ কি এই নয় যে, তারা কখনো

চাতুরীর জাল বোনে না? তুমি দেখছি কবিদের দল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে নভেলিস্টদের কুসঙ্গে পড়ে আর্টের মূলনীতি ভুলে যাচ্ছ।"

আমি মাথা হেঁট করে নীরবে পরিপাক করলুম।

"উপন্যাসকে আমি নীচু দরের আর্ট বলি কেন?" দাদা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "বলি এই জন্যে যে, তার প্রথম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে জীবনে যা মিথ্যা আর্টে তা সত্য। ঠিক আমাদের আদালতের জবানবন্দীর মতো। অমন করে মামলা জেতা যায়, পাঠকের মাথায় হাত বুলিয়ে দালান তোলা যায়, হয়তো একদিন নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবী কালের শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না, অন্নদাশঙ্কর।"

এসব যেন আমাকেই উদ্দেশ করে বলা। যেন আমি হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি মিথ্যা জবানবন্দী দিতে গিয়ে সরস্বতীর ধর্মাধিকরণে। আসামী যেমন বিচারকালে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে আমিও তেমনি হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকলুম।

"নোবেল প্রাইজের লোভ তোমারও আছে। না, ভাই?" এবার তিনি কোমল স্বরে বললেন।

"আছে।" আমি অস্ফুট স্বরে কবুল করলুম।

"ওটা দুর্বলতা। শুধু ও লোভ নয়, সব রকম লোভ কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে রেখো, যার সামনে দাঁড়িয়ে আছো সে তোমার পাঠকমণ্ডলী নয়, সে মহাকাল। তাকে কোনো মতেই ভোলানো যায় না। নিরেট নিপট সত্য কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই সে কানে তুলবে না। যদি রক্ত দিয়ে লিখতে পারো তা হলে সে-লেখার দাম আছে। আর সব তো সময়ের খেলনা।"

এর পরে তিনি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হলেন। আত্মমনস্ক বোধ হয়। কখন এক সময় বলতে আরম্ভ করে দিলেন, "তা আমারও লোভ ছিল কবিযশের। এক কালে কী যে ভালো লাগত নিজের লেখা ছাপার হরফে

দেখতে। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। কলেজে যখন ভর্তি হলুম তখন আমাকে ঘিরে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠল। আমার কবিতা ছাপা হতো 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'মানসী' প্রভৃতি সেকালের সেরা মাসিক-পত্রে। ওদের লেখা ফিরে আসত না-মঞ্জুর হয়ে। নয়তো ছাপা হতো মফঃস্বলের কোনো অখ্যাত পত্রিকায়। এই নিয়ে আমাদের মান-অভিমান হতো না তা নয়। তবু মোটের উপর আমরা ছিলুম বেশ। প্রায়ই আড্ডা বসত আমাদের এক জমিদার বন্ধুর বাড়ী। তাঁর জমিদারী উত্তর বঙ্গে। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে মাসোহারা আসত। কলকাতায় থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন। আমি পড়তুম রিপনে। সুরেন্দ্রনাথের উপর আমার অসামান্য ভক্তি ছিল। গবর্ণমেণ্টের উপর ছিল সেই পরিমাণ বিরাগ."

তিনি যেন তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির সাগর থেকে স্মৃতির মুক্তা তুলতে

"রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল প্রাইজ পান তার পরের বছর আমি এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করি। কেন জানো? রাত জেগে কবিতা লিখতুম আর সে-কবিতা ইংরেজীতে তর্জমা করে বিলিতী কাগজে পাঠাতুম। সে-বয়সে আমার আত্মবিশ্বাসের সীমা ছিল না। থাকলে আজ আমার এ দশা হতো না। মাইনর পোয়েট হয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমার জীবন হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু বাঙালীর বরাতে একবার যখন নোবেল প্রাইজ জুটেছে তখন আর একবার কি জুটবে না, যদি সাধনা করি, যদি সাধনার ফল জগতের সামনে ধরি? আমার বন্ধুরাও আমাকে উৎসাহ দিত, তাদের কারো ধারণা ছিল না যে নোবেল প্রাইজ অত সোজা নয়।" তিনি ম্লান হাসি হাসলেন।

"অল্প বয়সে আমারও ধারণা ছিল না।" আমি স্বীকার করলুম।

"তুমি তো ছেলেমানুষ ছিলে। তোমার চেয়ে যারা অনেক বড় তাদেরও মাথা ঘুরে গেছল। ডারবির টিকিট কেনার মতো লুকিয়ে

নোবেল প্রাইজের চেষ্টা করা তখনকার দিনে বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে আমার মতো নির্বোধ বেশি ছিল না। ওরা সবাই পাস করল, চাকরি বা ওকালতি যা হয় একটা কিছু করল, তার আগে বা তার পরে বিয়ে করল। আমিই শুধু পরীক্ষায় ফেল করলুম, চাকরি যদি বা পেলুম রাখতে পারলুম না, বিয়ে করতে গিয়ে শিশুপাল হলুম বনিতা আমার ভাগ্যে নেই, তবু যদি কবিতা আমাকে না ছাড়ত!" তিনি ভাবাবেগে নীরব হলেন।

"যাক, সে গল্প তোমাকে বলব না। এই যা বলছি এও বলতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এর দরকার ছিল। পরে বুঝতে পারবে কেন দরকার ছিল। এম. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছি শুনে আমার গুরুজন আমাকে কলকাতা থেকে এলাহাবাদে সরাবার উদযোগ করলেন। আমার কিন্তু কলকাতা থেকে নড়বার ইচ্ছা ছিল না। আমি ইতিমধ্যে "ভারতী"-গোষ্ঠীর লেখক হয়েছিলুম। "ভারতী" আমাকে একটা কাজ দিল। কলেজের পড়া সেই সঙ্গে চলল। বন্ধ হলো শুধু নোবেল প্রাইজের সাধনা। প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে সব কিছু করতে হতো, যায় চাঁদা আদায়। এখন মনে হচ্ছে এলাহাবাদে না গিয়ে ভুল করেছি। সেখানে আর যাই হোক সাধনার ব্যাঘাত হতো না। কিন্তু মানুষ তো ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। আমি পাস করলুম ঠিকই। পাস করতে না করতে চাকরিও পেয়ে গেলুম। উত্তর বঙ্গের সেই জমিদার যুবক কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে তাঁর জমিদারী ফেরৎ পেয়ে আমাকে সাধলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে। আমার কাব্যসাধনায় তিনি বাধা দেবেন না, বরং সব রকম সুবিধা করে দেবেন, এই সর্তে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হই।"

"গ্যেটের ভাইমার যাত্রার মতো লাগছে।" আমি মন্তব্য করলুম।

"কার সঙ্গে কার তুলনা!" তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। "অথচ এ কথা যদি সেদিন কেউ আমাকে বলত আমি মনে মনে

খুশি হতুম। তখনো আমার বিশ্বাস ছিল আমি একটা কেষ্ট বিষ্টু না হয়ে ছাড়বো না। কুমার রাধিকামোহন আমাকে গ্যেটের মর্যাদা দিয়েছিলেন। একখানা আস্ত বাগানবাড়ী ছিল আমার জন্যে বরাদ্দ। সেখানে থেকে আমি কাব্যচর্চা করতুম। উত্তর বঙ্গ আমি আগে দেখিনি। প্রথম দর্শনে তার প্রেমে পড়লুম। জমিদারের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে অনেক বার, কিন্তু উত্তর বঙ্গের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনি আজ অবধি। তুমি তো বাংলাদেশের সর্বত্র ঘুরেছ। কোন্ অঞ্চল তোমার সব চেয়ে ভালো লাগল ?"

"সর্বত্র ঘুরেছি বললে ঠিক বলা হবে না। তবে সব চেয়ে ভালো লাগল কোন্ অঞ্চল, বলব ?"

"বলো।" তিনি কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

"উত্তর বঙ্গ।"

"যা বলেছ। সত্যি ওর সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। আমি তো প্রথম কয়েকটা বছর মধুমাসের মতো কাটিয়ে দিলুম। বৌ নেই, তবু হানিমুন (honeymoon)। কুমার আমাকে য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করে দিলেন। কেন তিনি জানেন। খাটুনি ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল অবাধ ভ্রমণ।

গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাছারি করি, দেশকে চিনি। দেশের লোকের নাড়ি-নক্ষত্র জানি। ওরা আমাকে ভালোবাসে, আমিও ওদের ভালোবাসি। ওদের অনুরোধে ওদের উপকার করার জন্যে আমি লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে দাঁড়াই। হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলে আমাকে ভোট দেয়। এখনকার মতো সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তখনকার দিনে ছিল না। মেম্বর হতে না হতে চেয়ারম্যান হয়ে গেলুম তাদেরই সমবেত আগ্রহে। এখন মনে হচ্ছে ওটা আমার পরধর্ম। পরধর্মো ভয়াবহঃ।"

"তার পর ?"

"তার পর আরো জনপ্রিয়তা ছিল কপালে। গান্ধীজীর আবির্ভাব হলো। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দিলুম। রাজদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণ করলুম। ফিরে এসে দেখি আমার জন্যে গ্রামে গ্রামে তোরণ তৈরি হয়েছে। অন্তহীন সম্বর্ধনা। এমন সময় এক অপরিচিতা মহিলা এসে আমার দর্শন প্রার্থনা করলেন।" এই পর্যন্ত বলে দাদা সেদিন গা তুললেন।

(৩)

আর এক দিনের কথা। বলছিলেন প্রিয়দর্শনদা। শুনছিলুম আমি।—

সকালবেলা দোতলার ঘরে বসে লিখছি এমন সময় মাসী এসে খবর দিলেন কলকাতা থেকে কে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ভদ্রমহিলা! কলকাতা থেকে! আমি চমকে উঠলুম। মাসীকে বললুম, তুমি শুনলেই চলবে। আমার সাধ্যে কুলোলে সাহায্য করব। খুব সম্ভব কন্যাদায়ের চাঁদা।

মাসী তাঁর সঙ্গে কথা বলে তার পরে আমাকে জানালেন, না, ওসব কিছু নয়। তিনি একজন লেখিকা। এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। কলকাতা ফিরে যাবার আগে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

লেখিকা! আলাপ করতে চান! আমার ভাগ্য। চেহারাটাকে কবিজনোচিত করা সম্ভব ছিল না, ইতিমধ্যে আমলাজনোচিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পোশাকটাকে কবিসুলভ করতে কিছু সময় লাগল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কাব্য পড়ে যেমন ভাব কবি তেমন নয় গো। অতি সত্য কথা। জমিদারী চালাতে চালাতে আমার চালচলনে এমন একটা পরিবর্তন এসেছিল যা আমাকেই নিজের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ করে তুলত। আমি কি সেই মানুষ?

ভদ্রমহিলা আমাকে প্রতিনমস্কার করে বললেন, "আপনিই প্রিয়দর্শনবাবু?" এমন স্বরে বললেন যেন আমি নামে প্রিয়দর্শন, আসলে তা নই।

আমি সপ্রতিভভাবে বললুম, "এক কালে ছিলুম। এখনো লোকে সেই নামেই ডাকে।"

তিনি হেসে বললেন, "আমার নাম অনুপমা দেবী।"

ইনি "ভারতী"তে লিখতেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। যখন আমি "ভারতী"তে কাজ করি তখন এঁর কাছে লেখা চেয়ে চিঠি লিখেছি, এঁর লেখা পেয়ে এঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এঁর লেখার প্রুফ দেখেছি। তার উপর খোদকারিও করেছি। এই নিয়ে এঁর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যের মতো হয়েছিল। ইনি পরে আমাকে ক্ষমা করেছিলেন। তার জন্যে আমাকে কাগজে কলমে মাফ চাইতে হয়েছিল। লিখেছিলুম, দিদিরা ছোট ভাইদের দুষ্টুপনা সহ্য না করলে কে করবে।

সে সব কথা মনে ছিল না। মনে পড়ে গেল। খুশি হয়ে বললুম, "দিদি দেখছি তাঁর দুষ্টু ভাইটাকে ভুলে যাননি। কিন্তু আর বাবু বলে লজ্জা দেবেন না।"

মাসী জানতেন না কোন্ সুবাদে উনি আমার দিদি। মাসীকে সেসব কথা শোনাতে হলো। মাসী উঠে গেলেন চায়ের আয়োজন করতে।

দিদি বললেন, "যাক, ওসব কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না।"

আমি বললুম, "মন খারাপ করব যদি আপনি আমাকে 'আপনি' বলেন।"

"আচ্ছা, এখন থেকে 'তুমি' বলব। কিন্তু তোমার কী হয়েছে বলো তো? অনেক দিন তোমার কবিতা দেখিনে। দেখলেও তাতে রাজনীতির গন্ধ।"

এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। তারপর দিদি বললেন, "তোমার সঙ্গে আমি সাহিত্য আলোচনা করতে এসেছি, এটা লোক-দেখানো সত্য। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে।" বললেন নীচু স্বরে।

"তাই নাকি? বেশ তো।" আমি অভয় দিলুম।

"আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, এটাও লোকদেখানো সত্য। কলকাতার লোক আমরা। বেড়াতে আসব এই পাণ্ডববর্জিত দেশে!"

আমি নিঃশ্বাস চেপে বললুম, "তবে?"

"প্রিয়দর্শন, আমি তোমার দিদি তোমাকে অনুনয় করে বলছি, তুমি একথা আর কাউকে বোলো না। কুমারকে তো নয়ই, অন্য কোনো ইয়ার-বক্শীকেও না।"

আমি তাঁকে কথা দিলুম। বস্তুত আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না।

"যদি কোনো সূত্রে জানাজানি হয়ে যায় তা হলে একজনের সর্বনাশ হবে। সে বেচারী এমনিতেই কত কষ্ট পাচ্ছে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কি সইতে পারবে! হয়তো আত্মঘাতী হবে!"

আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশ করলুম না। শুধু বললুম, "জানাজানি হবে না, দিদি। আমি কবি হলেও কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। নইলে কেউ আমাকে জমিদারীর ভার দেয়?"

তিনি যে কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা এতক্ষণ লক্ষ করিনি, কোন্‌খান থেকে বার করলেন তাও এতদিন পরে মনে নেই। হঠাৎ এক রাশ চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি উপরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে এসো। খবরদার, কেউ যেন দেখতে না পায়। সর্বনাশ ঘটবে।"

স্বদেশীযুগের ছেলেরা যেমন রিভলবার বা পিস্তল পেলে আতঙ্কে উল্লাসে উত্তেজনায় দোদুল্যমান হতো আমিও তেমনি উদ্বেলচিত্তে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম। আমার একটা ইস্পাতের আলমারি ছিল। চিঠিগুলো তার একটা গোপন ডালায় রাখলুম। কেউ টের পেল না।

দিদি বললেন, "এখন তোমার হাতে একজনের সম্মান সঁপে দিলুম। তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই এ কাজের ভার দিচ্ছি। নইলে কলকাতা থেকে কেউ এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসে!" এখানে বলে রাখি যে

আমাদের এটা অজ পাড়াগাঁ নয়। মহকুমা শহর। রেল লাইনের ধারে। তবে আমরা যে অঞ্চলে থাকি সেটা পল্লীর সঙ্গে অভিন্ন।

আমি তাঁকে বার বার অভয় দিলুম। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তা বুঝতে পারছিলুম না। চিঠিগুলো গচ্ছিত রাখতে হবে, না পড়ে দেখতে হবে?

তিনি আমার সংশয় ভঞ্জন করে বললেন, "চিঠিগুলো অবসর পেলে পড়ে দেখবে। তার পর আমাকে ফেরৎ দেবে। আমি এখানে দিন চারেক আছি। আবার একদিন এসে হাজির হব। তুমি তোমার কবিতা পড়ে শোনাবে? কেমন?"

"আমার সৌভাগ্য। সেদিন যদি আপত্তি না থাকে আমাদের এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন। আজ তো আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। মাসী কী আয়োজন করছেন জানিনে।"

"আয়োজনটা গুরুতর বলেই মনে হচ্ছে। অন্য সময় হলে বাধা দিতুম, কিন্তু আজ আমি তাকে ব্যস্ত রাখতেই চাই। ততক্ষণ তোমাকে বলি একটা কথা।"

আমি মনোযোগ করলুম।

"ওকে ওর স্বামীর হাতে দিয়ে যাচ্ছি বটে, মনটা কিন্তু কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। পরের মেয়েকে নিজের বাড়ীতে ক'দিন আশ্রয় দেওয়া যায় বলো? সব জিনিসের একটা সীমা আছে। সেইজন্যে আমার এখানে আসা। এসেই শুনতে পেলুম তুমি এখানে আছো। মনে হলো অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটা ভেলা পেয়েছি। কেন বলতে পারব না, তোমার উপর আমার গভীর বিশ্বাস। তোমার কবিতা শুধু কবিত্ব করা নয়, তোমার ভিতরে যে মানুষটা আছে সেই মানুষটার পরিচয় দেওয়া। তাকে আমি স্নেহ করি, শ্রদ্ধা করি, তাকে আমি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করি।"

আমি বিচলিত হয়ে বললুম, "দিদি, আমি কি এর যোগ্য !"

"আমার মন বলছে তুমি যোগ্য। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমার অনিষ্ট হবে। প্রিয়দর্শন, তোমার অনিষ্ট হোক, তোমার দিদি এটা চায় না। ভেলাশুদ্ধ যদি ডোবে তা হলে তো বিপদের কথা। না, না। আমার ভুল হয়েছে তোমার কাছে আসা। পরের মেয়ের ভালো করতে গিয়ে পরের ছেলের মন্দ করব ?"

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুক দুড় দুড় করছিল। কিন্তু পুরুষ আমি, নারী যদি বিপন্ন হয়ে আমার শরণ নেয় কেমন করে শরণাগতাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেব ? মেয়েটি কে, কী তার বিপদ, আমার কাছে কী তার প্রত্যাশা এসব না জেনেশুনেই বলে বসলুম, "আমার অনিষ্টের জন্যে ভাববেন না। আমি যদি আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি তা হলে অনিষ্টের ভয়ে পেছিয়ে যাব না। তবে, হাঁ, আমার ক্ষমতা অল্প।"

দিদি খুশি হয়ে বললেন, "ক্ষমতা অল্প, কিন্তু প্রভাব অনেক। সকলে তোমার সুখ্যাতি করে। কেবল তোমার ম্যানেজারবাবু করেন না। ম্যানেজারের একটা দল আছে। তারাও তোমাকে সুনজরে দেখে না। তা কী করবে, বলো ? এমন মানুষ কে আছে যার শত্রু নেই ? সাবধানে থাকবে। ম্যানেজারকে একটু দূরে দূরে রাখবে।"

আমাদের স্থানীয় রাজনীতি ইতিমধ্যে দিদির কর্ণগোচর হয়েছে দেখে হাসি পেলো। বললুম, "দিদি, শহর থেকে আমি কতটা দূরে থাকি তা তো স্বচক্ষেই দেখছেন। কাছারির কাজ ছাড়া ওদের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগসূত্র নেই। সেইজন্যে ওরা আমার উপর রুষ্ট। কী করি, ওদের সঙ্গে মিশতে কি আমার অসাধ ! কিন্তু তা হলে সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিতে হয়।"

"না, ওদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তোমার ঐ ম্যানেজারটি একটি

ছদ্মবেশী রাক্ষস। মায়া মারীচ বা সোনার হরিণ। এমন দুষ্কর্ম নেই যা ওর অসাধ্য। তুমি একটু দূরে দূরে থাক বলে সব খবর রাখ না। এই ক' দিনে আমি ওর পরিচয় যা পেয়েছি তার পবে আমার বোনকে দোষ দিতে পারছিনে। বোন যাকে বলছি সে আমার মায়ের পেটের বোন নয়। পাতানো বোন। তা হলেও আপন বোনের মতো। তার স্বামীটিকে কলকাতায় যত বার দেখেছি তত বার প্রশংসা করেছি। মনে হয়েছে ম্যানেজার যদি রাখতে হয় তো এ রকম লোকই রাখতে হয়। আমার নিজেরও সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে। বেশির ভাগ উড়িষ্যায়। তোমার যদি কোনো দিন কাজের অভাব হয় আমাকে এক লাইন লিখো।"

আমার সঙ্গে দিদির সম্পর্ক লেখকেব সঙ্গে লেখিকার, আমার ইচ্ছা ছিল না যে তাঁর সঙ্গে আমাব সম্পর্ক মালিকের সঙ্গে কর্মচাবীর হয়। কিন্তু সাহস ছিল না তাঁর মুখের উপব সে কথা বলতে। নীরবে পবিপাক করলুম।

তিনিও যে একজন জমিদাব এ কথা জানার পর আমি তাঁর যথাযোগ্য আপ্যায়নের জন্যে বিশেষ চিন্তিত হলুম। তাঁর অনুমতি নিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করে বললুম, ব্যবস্থাটা রাজোচিত হওয়া চাই।

দিদি আমাকে মিঠেকড়া ধমক দিয়ে বললেন, "কেন ওসব করছ? আমি কি রাক্ষসী যে অত কিছু খাব? নিয়ে এসো এক গ্লাস ডাবের জল, না হয় মিছরির সরবৎ। দেখছ না কখন থেকে বকবক করছি!"

আবার ছুটে গেলুম মাসীর কাছে। বললুম, "যা হয়েছে নিয়ে এসো।"

দিদি দু-একটা জিনিস মুখে ছুঁইয়ে হাত ধোবার জল চাইলেন। বললেন, "খেয়ে বেরিয়েছি। ফিরে গিয়ে আবার খেতে হবে। কাজেই আমাকে মাফ করবেন, মাসীমা।"

তারপর আমাকে বললেন, "এবার চলো তোমার বাগান দেখাবে। শুনছি এমন সুন্দর বাগান এ অঞ্চলে নেই।"

বাগানটা আমার দেখবার মতো। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মাসীমাকে পরিহার করে আমার সঙ্গে গল্প করা। বাগান দেখতে দেখতে বললেন, "কুমার তোমাকে এই চমৎকার বাগানবাড়ীটা বাস করার জন্যে দিয়েছেন। তুমি বুঝি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ?"

"কে বলল এ কথা ?" আমি আশ্চর্য হলুম।

"জনরব। কেন, এতে লজ্জিত হবার কী আছে ? আমরা তো চাই তুমিই একদিন ম্যানেজার হও। ঐ শয়তানটাকে বিদায় করে দাও। ওটা না খেতে পেয়ে আসুক আমার খর্পরে। তা হলে হয়তো আমার বোনটি সুখী হবে।"

অদ্ভুত চিন্তাধারা। কী করে যে তিনি ও রকম ভাবতে পারলেন ? কিন্তু প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর আমার ছিল না।

"ওকে কেমন করে সিধে করতে হয় সে আমি জানি। কিন্তু এখানে থাকতে নয়।" তিনি বলে চললেন ফুল দেখতে দেখতে। "বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। এখানে ওর ভয়ে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। দারোগা ওর মুঠোর মধ্যে। এস. ডি. ও. নাকি ওর পরামর্শ না নিয়ে কোনো কাজ করে না। তাই বড্ড বাড় বেড়েছে লোকটার। কুমারের সঙ্গে তোমার গলায় গলায় ভাব। একদিন কথায় কথায় বলতে পারো না, ওটা নরকের কীট ? ওটাকে বরখাস্ত করা উচিত ?"

আমি বিরক্ত হয়েছিলুম। বিরক্তি চেপে বললুম, "তা হলে কুমার মনে করবেন আমি আমার উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে ম্যানেজারের নামে লাগাচ্ছি। ম্যানেজার তো থেকে যাবেই, মাঝখান থেকে আমার শত্রু বাড়বে।"

"যা বলেছ।" দিদি আমার সঙ্গে একমত হলেন। "না, সরাসরি

তুমি বলবে না কুমারকে। আর কাউকে দিয়ে বলাবে। নাপিত হলেই ভালো হয়।"

"কিন্তু দিদি," আমি দপ করে জ্বলে উঠলুম, "শিববাবু আমার এমন কোনো ক্ষতি করেননি যার জন্যে আমি তাঁর এতবড় অপকার করব।"

"যা বলেছ," তিনি এবারেও একমত হলেন। "আমি ভেবেছিলুম নিজের পদোন্নতির জন্যে তুমি হয়তো এ কাজ করতে রাজী হবে। সেটা আমার ভুল। তুমি সাধারণ লোক নও। তুমি কেন এমন হীন কাজ করবে!"

আমি তা শুনে গলে গেলুম। সে বয়সে মনটা ছিল মাখনের মতো।

"কিন্তু ভাই, আমি যে বড় আশা করে তোমার কাছে এসেছিলুম। আমার নিজের এক বিন্দু স্বার্থ নেই। মেয়েটি আমার নিকট বা দূর সম্পর্কের কেউ নয়। ওকে ওর ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসি। বিয়ের পর থেকে দেখাশুনা বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু চিঠি লেখালেখি শুরু হয়েছিল। সে সব চিঠিপত্র তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। পড়ে দেখো। অবশেষে সে আর সহ্য করতে পারল না। কলকাতা গিয়ে আমার শরণ নিল। আমি তাকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে চাইনি। কিন্তু যা শুনলুম ও তাকে ফিরিয়ে দিতে এসে যা দেখলুম তাতে আমার বুঝতে বাকী নেই যে লোকটা মানবরূপী দানব। তাকে একটা কঠিন আঘাত না দিলে সে মানুষ হবে না।"

ম্যানেজারকে আমি রোজ দেখছি। তিনি যে একজন ডাক্তার জেকিল ও মিস্টার হাইড এমন কথা কখনো আমার মনে উদয় হয়নি। আর কারো মনে উদয় হয়েছে বলে শুনিনি। তবে কি চাঁদের উল্টো পিঠ পুরুষদের চোখে পড়ে না, মেয়েদের চোখে পড়ে? কোথায় যেন পড়েছি, কে যেন লিখেছেন যে প্রত্যেক পুরুষেরই দু-দুটো রূপ। একটা রূপ তার স্ত্রীর কাছে, আর একটা অন্য সকলের কাছে।

"দিদি, এবার আমার সত্যি ভয় করছে।" আমি বললুম।

"কেন, কিসের ভয় ?"

"শিববাবুর হয়তো আর একটা রূপ আছে যেটা তাঁর স্ত্রীর চোখে দেখা। আমি তাঁর সে রূপ দেখিনি বলে নির্ভাবনায় বাস করছি, দেখলে হয়তো রাজ্যি ছেড়ে চলে যাব। আমাকে দিয়ে আপনার কোন্ কাজ হবে তা হলে ?"

"হাঁ, তোমার ভয়ের কারণ আছে বৈকি। ও যদি তোমাকে খুন করে, কেউ কোনো দিন ওকে সন্দেহ করবে না। পুলিশ ওকে রক্ষা করবে। কাজেই তোমাকে আমি অন্যায় অনুরোধ করব না। তুমি যদি চিঠি-গুলো পড়ে সন্তুষ্ট হও যে মেয়েটি একটা রাক্ষসের মুখে পড়েছে, তার পরে যদি কৃতসঙ্কল্প হও যে বিপন্নকে উদ্ধার করতে হবে, তা হলে তুমি যা ভালো মনে করো তা করবে।"

আমার তখন কম্পমান অবস্থা। ম্যানেজার আমাকে খুন করতে পারে শোনার পর থেকে আমার হাড়ের ভিতর বরফজল বইছে। আমি কী একটা বলতে চাইলুম, কিন্তু দাঁতে দাঁতে খটখটানি বেধে গেল।

তিনি তা লক্ষ করে হেসে ফেললেন। বললেন, "আচ্ছা লোকের কাছে সাহায্য আশা করেছিলুম। থাক তা হলে, দিয়ে দাও আমার চিঠির তাড়া।"

আমিও মনে মনে বললুম, "কন্যাদায়ের চাঁদা নয় রে বাবা। দশটা টাকা দিয়ে খালাস হব তার উপায় নেই। কবি প্রিয়দর্শন ভদ্র অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত।"

চিঠির তাড়া আনতে গেলুম বটে, কিন্তু আমার পৌরুষ বিদ্রোহী হলো। কিসের পুরুষ আমি, যদি নারী তার বিপৎকালে আমাকে ডেকে আমার সাড়া না পায়। কাগজে যখন নারীহরণের খবর পড়ি

তখন আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়। দেশে এতগুলো পুরুষ থাকতে কেউ একজন এগিয়ে যায় না রাবণ বধ করতে, বা রাবণের হাতে মরতে! বাংলা দেশ কি নিরস্তপাদপ! আমরা কি সব এরণ্ড! কবিতা লিখি বাংলা দেশের পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে।

আলমারি খুলতেই বেরিয়ে পড়ল আমার পিস্তল। কেউ যদি আমাকে খুন করতে আসে এই হবে আমার উত্তর। চিঠির তাড়ার বদলে পিস্তল হাতে করে নেমে এলুম। দিদি তা দেখে বিস্মিত হলেন।

বললুম, "আমি কাপুরুষের মতো মরব না, দিদি। মরতে যদি হয় তো পুশকিনের মতো মরব।"

দিদি জানতেন না পুশকিন কে! তাঁকে বলতে হলো, "রুশ দেশের সেরা কবি পুশকিন স্ত্রীর সম্মানের জন্যে ডুয়েল লড়ে মারা যান।"

তিনি হেসে বললেন, "আর বাংলা দেশের সেরা কবি প্রিয়দর্শন পরস্ত্রীর সম্মানের জন্যে ডুয়েল লড়ে মারা যাবেন।"

আইডিয়াটা আমার খাসা লাগছিল। একশো বছর পরে যখন প্রিয়দর্শন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে তখন পুশকিনের সঙ্গে আমার তুলনা করা হবে। মহিমা বেশি হবে আমারই, কারণ আমার মৃত্যু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তবে আমি না মরে যদি শিবপদ মারা যায় তা হলেই হয়েছে! তখন আমার ফাঁসি হবে। ও কথা মনে হতেই আবার আমার দাঁতে দাঁতে খট্‌খটানি।

পিস্তলটাকে যথাস্থানে বন্ধ করে এলুম। কন্যাদায়ের চাঁদা নয়। এ যে বিষম ধাঁধা। হায় কবি প্রিয়দর্শন!

দিদি বিদায় নিলেন আর এক দিন আসবেন বলে। আমি তাঁকে যথারীতি নিমন্ত্রণ করলুম। কিন্তু যতই ভেবে দেখলুম ততই নিজের যোগ্যতায় সন্দিহান হলুম। আমি সাহিত্যিক মানুষ। কাছারির কাজ করে যেটুকু সময় পাই সাহিত্যের পিছনে ব্যয় করি। লোকাল বোর্ডের

চেয়ারম্যান হয়ে অবধি তাতেও টান পড়ছে। আমি আমার নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত। হঠাৎ আমার উপর সীতা-উদ্ধারের দায় চাপিয়ে দিলে আমি পারব কেন ?

আর দিদির সব কথা বেদবাক্য বলে মেনে নেবই বা কেন ? যাকে তিনি রাবণ ঠাউরেছেন সে হয় তো সাধারণ একজন অত্যাচারী স্বামী। অমন কত আছে! আমি কি তাদের সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে মরব! মেয়েরা যদি পড়ে পড়ে মার খায়, পালটা মার দিতে না শেখে, তা হলে তাদের দুঃখ কেউ কোনো দিন দূর করতে পারবে না। অত্যাচার আবহমান কাল চলে আসছে। আবহমান কাল চলতে থাকবে। মাঝ-খান থেকে আমি কেন জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করি ?

চিঠিগুলো পড়তে ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্বিধাও ছিল। পরের চিঠি পড়া কি উচিত ? আলমারিতে বন্ধ করার সময় কয়েকখানার উপর দৃষ্টিপাত করেছিলুম। কোনোটা শিববাবুর লেখা, কোনোখানা আভা দেবীর। এদের কারো অনুমতি নিইনি। বিনা অনুমতিতে পরের চিঠি পড়াও তো চুরি করা। দিদির কথায় চুরি করা যেমন অন্যায় দিদির কথায় চিঠি পড়াও তেমনি।

আলমারি খুলে চিঠিগুলো পড়তে বসা এক মিনিটের কাজ। কিন্তু এত সহজ বলেই ও কাজ এত কঠিন! আমি আরো চিন্তা করব বলে সময় নিলুম। আপাতত হাতের কাজে মন দেওয়া দরকার। মন দিতে পারছিলুম না, তবু চেষ্টা করলুম।

থেকে থেকে আমার শঙ্কা বোধ হচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ কলকাতা থেকে এক ভদ্রমহিলা এসে আমার প্রশান্তি ভঙ্গ করলেন। এখন এর পরিণাম কী হবে! এত দূর এগিয়ে তার পরে পেছিয়ে যাওয়া ভালো দেখায় না। পেছিয়েই যদি যাব তবে চিঠিগুলো ফেরত দিলেই চুকে যেত। পিস্তল বার করে বীরপুরুষ সাজার দরকার

কী ছিল। কবিরা যে বীরপুরুষ নয়, বাল্মীকি যে রামচন্দ্র নন, ব্যাসদেব যে অর্জুন নন, কে না জানে! দিদি উপহাস করতেন, কিন্তু কিছু মনে করতেন না। তাঁর চোখে বীরপুরুষ হতে গিয়ে বড বেশি দূর এগিয়েছি। কী এক অনির্দিষ্ট নিয়তির পানে পা বাড়িয়ে দিয়েছি।

জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলোর সূত্রপাত এই রকম ছোটখাটো ঘটনা থেকেই হয়।—বলতে লাগলেন প্রিয়দর্শনদা।

আমি কবি প্রিয়দর্শন, আমার কী দরকার ছিল পরের চিঠি পড়ার। কোন কাজের কী পরিণাম তখন যদি জানতুম তা হলে আমার দুর্দমনীয় কৌতূহলকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতুম। কিন্তু তখন সেটা বীরত্বের ছদ্মবেশ পরে এসেছিল। তাই সেটাকে কৌতূহল বলে চিনতে পারিনি।

চিঠিগুলো পড়তে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। না পড়লেও চলত। পড়ব বলে তুলে রেখেছিলুম বলে পড়বই পড়ব এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি। অনায়াসে বলতে পারতুম, এই নিন, দিদি, আপনার চিঠির তাড়া। পরের চিঠি পড়া আমার দ্বারা হলো না। বিবেক অনুমতি দিল না।

কিন্তু দিদি তা শুনে কী মনে করতেন! হয়তো ঠাওরাতেন কবিদের কাব্য এক রকম, জীবন আর এক রকম। কবিতা বীররসে পূর্ণ, জীবন ভয়ভাবনায় ভরা। বেচারা প্রিয়দর্শন গোটা কয়েক বীররসের কবিতা লিখেছে বলে এমন কী অপরাধ করেছে যে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে কাপুরুষ নয়, সে বীরপুরুষ। আচ্ছা, ভাই প্রিয়দর্শন, তুমি নিরাপদে বেঁচে বর্তে থেকে রাজদ্রোহ সমাজদ্রোহ বাঁচিয়ে কাগজে কলমে দেশ উদ্ধার করতে থাকো। দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সৃষ্টি নন্দলালের মতো তুমিও অমর হও। তোমার কাছে বীররসের কবিতা চাইতে আসা উচিত ছিল। তা না করে বীরোচিত জীবন চাইতে এসেছিলুম। আচ্ছা, এর পরে যদি কখনো বীরত্বপূর্ণ কবিতার প্রয়োজন হয় তোমাকে জানাব।

কাব্যের সঙ্গে জীবনের সঙ্গতি থাকবে, এরূপ একটা প্রত্যাশা আমার নিজের কাছে নিজের ছিল। দিদির ছিল কি না জানিনে। মনে হলো দিদিরও আছে। প্রত্যেক পাঠকের আছে। যে কবিতা লিখবে সে কবিতার মতো করে বাঁচবে, তবেই তার কবিতা সার্থক, তার জীবন সার্থক। আমার এই প্রত্যয় আমাকে বীরোচিত জীবনের প্ররোচনা দিয়েছিল বলেই না আমি রাজদ্রোহের কবিতা লিখে কারাবরণ করলুম। একবার কারাবরণের পরে আমি নিজের চোখেই যথেষ্ট বড় হয়েছিলুম। দিদির চোখে বড় হতে চাওয়া বিচিত্র নয়। অন্তত ছোট হতে যাওয়া অস্বস্তিকর।

এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে চিঠিগুলো পড়তে বসলুম। বিবেকের বাধা মানলুম না। কতক চিঠি আভা দেবীর লেখা। কতক শিববাবুর। অবশিষ্ট দিদির, অর্থাৎ অনুপমা দেবীর। তিন জনের ধরন তিন রকম। হাতের লেখা, লেখার ভাষা, বলার কথা। মনে হলো যেন আমরা চার জনে মিলে আলাপ করছি। আমিও একজন। আমার যোগদান অপর তিনজনের অলক্ষ্যে, তবু আমিও তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত। আমরা চার জনে মিলে চতুরঙ্গ। আশ্চর্য! এ কথা মনে আসতেই বিবেকের ভার একেবারে হাল্‌কা হয়ে গেল। বাধা তো পেলুমই না, বাধার কল্পনা কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমিও চতুরঙ্গের অঙ্গ। আমারও এই উপাখ্যানে একটা অংশ আছে। এত দিন এ উপন্যাস শেষ হয়নি আমারি অপেক্ষায়। আমার ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতে হবে, এই হচ্ছে জীবন-নাট্যকারের নির্দেশ। আমার সাধ্য কী যে আমি এড়িয়ে থাকব আমার নিয়তি!

চিঠিগুলো পড়ে চললুম। পড়তে পড়তে কৌতূহল বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল ভয়, লজ্জা, ক্রোধ। একটা কী-করি, কী

করি ভাব এলো।' মাথার চুল ছিঁড়ি আর ভাবি, কী করা যায়, কী করা উচিত। যেন কেউ আমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে যে কিছু একটা করতেই হবে। না করলে নয়।

অদ্ভুত! না? এখন পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর নিজের মূঢ়তায় অবাক হচ্ছি। নিরাসক্ত ভাবে বিচার করলে মনে হবে, কিছু না করলেও চলত। চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে বললেই যথেষ্ট হতো যে, আমার কিছু করবার নেই। আমি বড় জোর কিছু পরামর্শ দিতে পারি। কিন্তু পরামর্শ দেবার মধ্যে পৌরুষ কিছুমাত্র ছিল না। পরামর্শ চাইছেই বা কে! দিদি চান একটা হাতে কলমে সমাধান। যাকে দিয়ে তা হতে পারে তেমন মানুষ তাঁর মতে প্রিয়দর্শন ভদ্র। কারণ এই লোকটি কেবল কবি নয়, কেবল বাক্যের সঙ্গে বাক্যের মিল দিয়ে ক্ষান্ত নয়, কবিতার সঙ্গে জীবনেরও মিল দিয়ে থাকে। নইলে জেল খাটতে যায় কোন্ দুঃখে!

বিশ্রী চিঠি। বীভৎস ব্যাপার। সব কথা তোমাকে বললে তুমিও কানে আঙুল দেবে। সব কথা আমার মনেও নেই। এই চোদ্দ-পনেরো বছরে বিস্তর ভুলেছি। ইচ্ছা করেই ভুলেছি। তবু যা স্মরণ আছে তাই বা কম কী। তোমার অত সময় নেই, তা ছাড়া আমি গুছিয়ে বলতেও জানিনে। যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছি। লিখতে বসলে অন্য রকম করে লিখতুম।

শোন। শিববাবুরা প্রাচীন জমিদার বংশ। শরিকান স্বত্বে শিববাবুর ভাগে যা পড়েছিল তা মর্যাদার সঙ্গে বাস করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষেত্রে অপরে যা করে থাকে, শিববাবুও তাই করলেন। অর্থাৎ বড়লোকের বাড়ী বিয়ে। অবস্থার দিক থেকে বড়লোক, কিন্তু সম্ভ্রমের দিক থেকে ছোট। এই কারণে স্ত্রীকে তিনি বরাবর একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। অথচ অপূর্ব সুন্দরী তাঁর স্ত্রী। কেবল

রূপবতী নন, গুণবতী। তখনকার দিনে লেখাপড়ার সঙ্গে বিয়ের কোনো সম্বন্ধই ছিল না। তা সত্বেও তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন ভালোই। তাঁর দাদা অধ্যাপক। বোনকে নিজের হাতে গড়েছিলেন তাঁরই মতো কোনো অধ্যাপকের ঘরণী হবার জন্যে। বাবা আবগারি কর্মচারী। বহু টাকা জমিয়েছিলেন, তার জোরে জাতে উঠতে চেয়েছিলেন জমিদার বংশে মেয়ের বিয়ে দিয়ে। জামায়ের পড়াশুনা বেশি নয়, কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত কাজে সহজাত নিপুণতা ছিল। অন্যান্য শরিকের সম্পত্তি তিনিই দেখাশুনা করতেন। পরে তিনি অপরের ম্যানেজার হন। অনেক জায়গায় ম্যানেজারি করার পর কুমার রাধিকামোহনের ম্যানেজার হয়ে আসেন। চিঠিগুলো বিভিন্ন সালে বিভিন্ন জমিদারী থেকে লেখা।

পর পর দুটি সন্তান হবার পর আভা দেবী লক্ষ করলেন—কী লক্ষ করলেন তা কি তোমাকে অত কথায় খুলে বলতে হবে? আচ্ছা, া হলে শোন। তিনি লক্ষ করলেন—নাঃ আমি বলতে পারব না। তুমিই যা হয় এক রকম কল্পনা করে নিয়ো। মোট কথা, শিববাবু আর ছেলেপুলে চাইলেন না। বললেন, জমিদার বাড়ীতে দুটিই যথেষ্ট, নইলে সম্পত্তি ভাগ হতে হতে কড়া ক্রান্তিতে ঠেকবে।

স্ত্রীর মনে দুঃখ হবে তিনি তা জানতেন। ব্যথার উপর প্রলেপ দিতেন এই বলে যে, অভিজাতদের নীতিশাস্ত্র ও মধ্যবিত্তদের নীতিশাস্ত্র এক নয়। তাঁদের মূল্যবোধও স্বতন্ত্র। অভিজাতরা স্ত্রীর রূপলাবণ্যকে এতবেশি মূল্য দেন যে, স্ত্রীকে বহু সন্তানবতী হতে দেন না। সেইজন্যে দুটি একটি সন্তান হবার পর স্ত্রীর কাছে আসেন না। অন্যত্র যান। আর মধ্যবিত্তরা একত্রবাসকে এত বেশি মূল্যবান মনে করেন যে স্ত্রীকে বহু সন্তানবতী হতে দিয়ে তার রূপলাবণ্য ধ্বংস করেন। তবু পারত-পক্ষে অন্যত্র যান না। বড় ঘরের মহিলারা সারা জীবন সুন্দরী থাকেন।

ছোট ঘরের মেয়েরা অকালে বুড়িয়ে যায়। বুর্জোয়া মরাল কোড এর জন্যে দায়ী। কিন্তু শিববাবু তো বুর্জোয়া মরাল কোডের দ্বারা শাসিত নন। তাঁকে শাসন করে য়্যারিস্টোক্র্যাটিক মরাল কোড। তাঁর স্ত্রীকেও।

স্বামীর চিঠিতে এসব তত্ত্বকথা পড়ে আভা দেবী যেমন আহত তেমনি অপমানিত বোধ করতেন। সন্তানজননীকে আত্মহত্যার চিন্তা মনে আনতে নেই। তবু সে চিন্তা বার বার উদয় হতো। মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি। মেয়েদের দৌড় বাপের বাড়ী। কয়েক বার দৌড় দিয়ে দেখলেন তাতে বাপ-মাকে বিব্রত করা হয়। স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করা হয় না। তা ছাড়া ছেলেমেয়েরই বা অপরাধ কী! কেনই বা তারা পরের বাড়ী মানুষ হবে! জমিদারবাড়ীর শিশু জমিদার বাড়ীতে মানুষ না হলে সহবৎ ভুলে যায়। আভা দেবীর মনেও আভিজাত্যের ছোঁয়াচ লেগেছিল। তা বলে তিনি অভিজাতদের মরাল কোড মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

আচ্ছা, তুমিই বলো এ ছাড়া আর কী উপায় আছে যাতে তোমারও রূপযৌবন রক্ষা হয়, আমারও বিষয়সম্পত্তি? প্রশ্ন করতেন শিববাবু।

আভা দেবী এর উত্তর দিতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজে পা দিতেন। এক বার বললেন, ব্রহ্মচর্য। স্বামী যেন এই কথাটির প্রতীক্ষায় ছিলেন! বললেন, এই তো আমি চাই। তুমি মনে প্রাণে এই নিয়ে থাকো। আমার কথা যদি বলো, আমি পাপী তাপী মানুষ। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে গিয়ে দু'বেলা কত পাপ করতে হচ্ছে। পাপের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছি আমি। আমার কি সাধু হওয়া সাজে। বলো তো সাধু হয়ে বনে চলে যাই। তখন এ সংসারের ভার তোমার উপর পড়বে কিন্তু।

চিঠিপত্রের এই পর্যন্ত পড়ে পড়া বন্ধ করলে শিববাবুকে আমি খুব বেশি দোষ দিতে উদ্যত হতুম না। কিন্তু এর পরে যা এলো তা ভয়ঙ্কর।

আভা দেবী কেমন করে জানতে পেলেন যে তাঁর স্বামী তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়েছেন। রাত্রে শ্মশান অঞ্চলে গিয়ে ভৈরবীচক্রে বসেন। বলা বাহুল্য ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে নয়। তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চ ম'কারের ব্যবস্থা আছে। তিনি তার কোনো একটিকে অবহেলা করতেন না। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে এক দফা পত্রবিতর্ক চলল।

শিববাবু বললেন, তোমাকে ভালোবাসি বলেই এসব করি। উপপত্নী গ্রহণ করলে কি তুমি সুখী হতে?

আভা দেবী বললেন, তা বলে তুমি ধর্মের নাম করে কতগুলো গরিবের মেয়ের ধর্মনাশ করবে! তার চেয়ে গণিকা ভালো।

শিববাবু যেন এই কথাটির জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, তাতে যদি তুমি সুখী হও তা হলে সেই ভালো। আচ্ছা, এখন থেকে তোমার কথা রাখব।

আভা দেবী নিজের বাক্যের জালে নিজেই বন্দী হলেন। কী করবেন উপায় খুঁজে পেলেন না। কেমন করে স্বামীকে ফেরাবেন! লোকটা যে তাঁকে ভালোবাসে না তা নয়। কিন্তু লোকটা ভালো লোক নয়।

এই সিদ্ধান্তে পৌছাবার পর তিনি দিদিকে স্মরণ করলেন। এখন থেকে দিদির সঙ্গে চিঠিপত্র শুরু। বছর দুই ধরে দিদির সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলল।

ইতিমধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর স্বামী তাঁর বেনামীতে তালুক কিনতে আরম্ভ করছেন। টাকা কোথায় পেলেন? স্ত্রীর কাছে তো চাননি। অনুসন্ধান করতে করতে যা শুনতে পেলেন তা রোমহর্ষক। একটা ডাকাতের দলের সঙ্গে নাকি তাঁর স্বামীর বন্দোবস্ত ছিল। তিনি তাদের আইনের হাত থেকে বাঁচাবেন, তারা তাঁকে বখরা দেবে।

একথা কানে আসতেই তিনি কলকাতা গিয়ে দিদির বাড়ী উঠলেন ও সেখান থেকে পত্রক্ষেপ করলেন। আর এক দফা মসীযুদ্ধ চলল।

স্ত্রী প্রশ্ন করলেন, এসব কী শুনছি! তোমার কি ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই?

স্বামী উত্তর দিলেন, কেন? উকিলেরা তো নিত্য ঐ কর্ম করছে। ওরা আদালতের সাহায্যে করে। আমি পুলিশের সাহায্যে করি। এমন কী তফাৎ?

এটা কি অভিজাতদের উপযুক্ত কর্ম? উকিলরা কি অভিজাত?

তা যদি বলো, আমাদের সাত পুরুষ এই ভাবে ধনসংগ্রহ করে এসেছে। এমন কোন জমিদার বংশ আছে যে বংশের কেউ না কেউ ডাকাতের দল পোষেনি? লাঠিয়াল বলে দিনের বেলা যাদের পরিচয় ছিল রাত্রিবেলা তাদের অন্য রূপ দেখা যেত, যখন এত বেশি থানা পুলিশ ছিল না।

তা বলে তুমি লুটের ধন দিয়ে আমার নামে সম্পত্তি কিনবে!

তোমাকে ভালোবাসি বলেই তোমার নামে কিনি। আমি যেদিন থাকব না তুমি সেদিন ভোগ করবে। তুমি ও তোমার পুত্রকন্যা। যদি ভাগ করবার মতো সম্পত্তি হাতে পাই তা হলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার তোমার কাছেই ফিরে আসব। আরো হবে।

ইঙ্গিতটা এত স্পষ্ট যে আভা দেবী থ' হয়ে গেলেন। চিঠি লেখা তখনকার মতো বন্ধ হলো। তিনি দিদিকে ধরে বসলেন তাঁকে যেন আর স্বামীর ঘর করতে না হয় এমন একটা উপায় বাতলে দেন। এবার তিনি ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাননি। কাজেই তাদের খাতিরে ফিরে আসার আবশ্যক ছিল না। তবে তাদের দেখতে ব্যাকুলতা ছিল বৈকি। সেইজন্যে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে সাহস হচ্ছিল না।

দিদি বললেন, পাগলী, স্বামীর ঘর না করে কেউ পারে! অমন কথা চিন্তা করাও পাপ। স্বামী যদি অন্যায় করেই থাকে তবু তাকে ত্যাগ করতে নেই। তাকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য। দূর থেকে সেটা সম্ভব নয়। নিকট থেকেই সম্ভব। তোমাকে ফিরে গিয়ে

স্বামীর প্রাত্যহিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। স্বামীও তো বলতে গেলে ছেলের মতো। ছেলেকে কি কেউ ফেলে আসতে পারে! তাকে নিজের হাতে মানুষ করতে হয়। তা তুমি তো ছেলেকেও ফেলে এসেছ। মেয়েকেও।

আভা দেবী কিছুতেই রাজী হলেন না। দিদির কাছে দিনের পর দিন কাটালেন। দিদি তাঁর আপন দিদি নন। পরের মেয়েকে কত কাল আশ্রয় দেবেন! তার স্বামী যদি দাবি করে তখন কী করবেন! শিববাবুকে চিঠি লিখে স্তোক দিয়ে তিনি কত কাল নিরস্ত করবেন!

দিদি যখন দেখলেন যে আভা দেবী কিছুতেই যাবার নাম করবেন না তখন নিজেই তাঁকে তাঁর স্বামীর ঘরে পৌঁছে দেবার আয়োজন করলেন। তাঁর একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন শিববাবুর কর্মস্থানে। তাঁকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায় ডাকিয়ে নিয়ে ব্যাপারটা যথাসম্ভব রেখে ঢেকে বুঝিয়ে বললেন। আত্মীয় শশব্যস্ত হয়ে তাকে কী একটা উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করলেন। বোধ হয় অন্নপ্রাশনেব। সকলের জন্যে যথাযোগ্য উপহার কিনে দিদি চললেন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সঙ্গে আভা দেবী।

তারপর আমাদের মহকুমা শহরে কলকাতার সেই ভদ্রমহিলার সদয় পদার্পণ। নাকে দেবার জন্যে ভাগ্যিস এক রাশ রুমাল এনেছিলেন। নইলে তিনি সেই দিনই ফিরতি ট্রেন ধরতেন। তা হলেও আমাদের পক্ষিরাজের গাড়ীতে চড়ে তাঁর পক্ষাঘাতের মতো হয়েছিল। দিন কয়েক বিশ্রাম করতে বাধ্য হলেন। ইত্যবসরে শিববাবু সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করলেন। খোলা মন নিয়ে এসেছিলেন, আগে থেকে বিচারফল স্থির করে আসেননি। কিন্তু সন্ধান করে যা জানলেন তা আভা দেবীরও অজানা। লোকটা খুন পর্যন্ত

করিয়েছে। একবার যদি তার মাথায় ঢোকে যে অমুক আমার শত্রু তা হলে অমুকের ভিটে মাটি উচ্ছন্ন তো করবেই, বাধা পেলে মিথ্যা মামলা সাজাবে, তাতে যদি সে খালাস পায় তবে তাকে মারতে মারতে মেরে ফেলার হুকুম দেবে। যারা বেঁচে গেছে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আর শত্রুতা করেনি। যারা মরে গেছে তারাও শত্রুতা করতে পারছে না।

আভা দেবী যে এই রাক্ষসকে নিজের সৎ প্রভাবের দ্বারা মানুষ করতে পারবেন, এ বিশ্বাস ক্রমে হারিয়ে ফেললেন দিদি। বোনটিকে এর হাতে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে একে শুদ্ধ কলকাতা নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। তার পর সেখানে তিনি স্বয়ং এর উপর প্রখর দৃষ্টি রেখে এর স্বভাবের পরিবর্তন যাতে ঘটে তার কিনারা করবেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাবেই বা কেন এ ?

দিদি দেখলেন শিববাবুকে এখান থেকে কলকাতায় সরাতে হলে কুমার রাধিকামোহনের সেরেস্তা থেকে তাড়াতে হয়। কুমারকে তিনি চিনতেন না। কুমারের কে কে অন্তরঙ্গ তার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি পেয়ে গেলেন আমার খোঁজ। তখন তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমাকে দিয়ে কুমারকে প্রভাবিত করে শিববাবুকে বরখাস্ত করাবেন ও নিজে তাঁর হিতৈষী সেজে তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাবেন অন্ত কোনো চাকরির আশা দিয়ে। শিববাবু গেলে আমিই তো ম্যানেজার হব, সুতরাং আমারও স্বার্থ তাঁকে তাড়ানো। এইজন্যে আমার কাছে আসা, আমাকে চিঠিপত্র পড়তে দেওয়া, ষড়যন্ত্রের শরিক করা। আমাকে দিয়ে এ কর্ম যদি না হয় তা হলে আর কাউকে দিয়ে করানো যায় কি না সে কথাও তিনি ভাবছেন। সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন তিনি।

ম্যানেজারটা যে এত বড় একটা শয়তান এত দিন আমার জানা

ছিল না। রাগে আমার অন্তঃকরণ জ্বলছিল। এই লোকটার সঙ্গে একই জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতে ঘেন্না বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলুম কুমারকে বলব, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কোথাও চলে যাই, এখানে আমার অনেক দিন থাকা হলো, কবিদের কি কোনো এক জায়গায় চিরদিন থাকতে ভালো লাগে!

কিন্তু বিষয়টা আমার সুখদুঃখ নয়, আভার সুখদুঃখ। ওকে আমি নিজের বোনের মতো মনে করতে শুরু করেছিলুম। আমি চলে গেলে ওর দুঃখ কমবে না, বল কমে যাবে। ওকে অমন অবস্থায় ফেলে যাওয়া কাপুরুষতা। তা বলে ম্যানেজারের মতো একটা শয়তানের অধীনে কাজ করাও পুরুষোচিত নয়। আভাকে আর কোথাও নিয়ে যেতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হতো। তা যদি সম্ভব না হয় তা হলে শিববাবুকে বরখাস্ত করাই মন্দের ভালো। তাতে আমারও শান্তি, দিদিরও অভীষ্টসিদ্ধি। কে জানে হয়তো আভারও দাম্পত্য সুখ।

আভাকে আর কোথাও নিয়ে যাবার কথা ভেবে দেখলুম। আইডিয়াটা আমার নয়, আভার নিজের। সে আর এমন স্বামীর ঘর করতে চায় না। যার ধর্মাধর্মজ্ঞান নেই তার সহধর্মিণী হওয়া তো পাপের ভাগী হওয়া। লোকটা ডাকাতি করতে করতে কোন দিন ধরা পড়বে। খুন করতে করতে কোন দিন ফাঁসি যাবে। স্বামীর ঘর ছেড়ে আর কোথাও চলে গেলে যদি স্বামীর চৈতন্য হয়। চৈতন্য হলে পরে তখন ফিরে আসা যাবে। তার আগে নয়।

কিন্তু গোড়ায় গলদ আভার দুটি শিশু। বড়টির বয়স সাত-আট। ছোটটির পাঁচ-ছয়। কিছু দিন এদের মমতা কাটিয়ে আর কোথাও থাকা যায়। কিন্তু সেই কিছু দিন কি চৈতন্য সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট? ভগবানের বিশেষ করুণা বিনা অত কম সময়ে কারো চৈতন্য উদয় হয় না। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় এ পাকা

ঘুঁটি এক চালে কাঁচবে না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু সবুর করতে হলে শিশু দুটিকেও সঙ্গে নেওয়া চাই। তা কি সম্ভব! বাপ যদি দাবি করে তখন? আইন তো বাপের দিকেই ঝুঁকবে। যে জননী স্বামীগৃহে বাস করে না তার চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলে আদালত তাকে তার সন্তানের ভার দেবে না। তা ছাড়া খোরপোষের প্রশ্ন আছে। বাপ যদি না দেয় মা কার কাছে হাত পাতবে! নিজের কী করে চলবে সেই ভাবনাই যথেষ্ট। এমন বাল্মীকি মুনি কে আছেন যে সীতাকেও দেখবেন, তার শিশু দুটিকেও পালবেন?

এক বার খেয়াল হলো, কেন, আমি তো আছি। কবি প্রিয়দর্শন কী করে মহাকবি হবে যদি বাল্মীকির মতো মহান দায়িত্ব বহন করতে না পারে? সীতা বাল্মীকির কেই বা ছিলেন! আভা প্রিয়দর্শনের নাই-বা হলো কেউ। একটি দুঃখিনী নারীর জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করা কি একটা মহৎ ব্রতের জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করা নয়? যার জীবনে তেমন কোনো মহৎ ব্রত নেই, কোন্ চালাকির দ্বারা সে মহাকবি হবে?

ভাবতে লাগলুম। এখন হাসি পায়, কিন্তু আমার নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাকবি? হাঁ, মহাকবি হবার সম্ভাব্যতা আমার মধ্যেও আছে। সম্ভাব্যতাকে সুযোগ দিলে সে একদিন সম্ভবের পর্যায়ে উঠবে। সুযোগ কি গাছে ফলে? এই তো সুযোগ। এ ধরনের সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে! একটা চাকরি, একখানা বাড়ী, একটি স্ত্রী, এসবকে যদি সুযোগ বলো তো বহু লোকের জীবনে এ সুযোগ জুটেছে। অথচ তারা কেউ মহাকবি দূরের কথা, বড় কবি হয়নি। তার কারণ, সুযোগ বলতে কবির জীবনে যা বোঝায় তা সুখের সুযোগ নয়, তা দুঃখের সুযোগ। বিপদের সুযোগ, সঙ্কটের সুযোগ, সংঘাতের সুযোগ।

হাঁ, সুযোগ এসেছে আমার জীবনে। মহাকবি বাল্মীকির জীবনে

যে সুযোগ এসেছিল। আমি যদি এ সঙ্কটে উত্তীর্ণ হই তা হলে বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হব। নয়তো বাংলা সাহিত্যের এক কোণে একটি কুলুঙ্গিতে আসন পাব। লোকে বলবে, ভদ্র কবি।

এমন একটা ঝড় বইতে লাগল আমার অন্তর্জীবনে যে আমার বহির্জীবনও তার দাপটে বিপর্যস্ত হতে বসল। মাসী বুঝতে পারলেন না আমার কী জ্বালা। কেন আমি অমন ছটফট করছি? কী আমার বিপদ? কেন আমার মুখ অত ফ্যাকাশে? আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ রে, তোর কি কোনো অসুখ করেছে? কই, না তো! গা তো গরম নয়। যা তুই এক বার ডাক্তারকে দেখিয়ে আয়। আমি তাঁকে অভয় দিয়ে বলি, ও কিছু নয়। একটা দুর্ভাবনা। দেশের জন্যে ভাবছি। আবার কবে জেলে যেতে হবে।

তারপর দিদি এলেন নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। প্রথম কথা, চিঠিগুলো পড়া হয়েছে? দ্বিতীয় কথা, কী করতে বলো?

বললুম, আভার দিক থেকে বিবেচনা করলে দুটি পথ আছে। একটি—আপনার দেখানো পথ। আর একটি—আমার দেখানো পথ। আমার দেখানো পথটাই সব চেয়ে ভালো। আপনার দেখানো পথটা মন্দের ভালো। এখন আভার যেটা অভিরুচি।

তিনি জানতে চাইলেন আমার দেখানো পথ কোন্‌টা। বললুম, স্বামীর ঘর থেকে দীর্ঘকালের জন্যে বিদায় নেওয়া। ছেলেমেয়ের মমতা কাটানো। স্বামীর চৈতন্য উদয় হলে ফিরে আসা। না হলে, না আসা।

প্রিয়দর্শনদা বলে চললেন—

তার পরে দিদির সঙ্গে আমার মতভেদ ক্রমে বাড়তে থাকল। আভাকে তিনি দুটোর একটা পথ বেছে নিতে দেবেন না। তার অভিরুচির উপর নিজের অভিরুচি আরোপ করবেন। ওতেই নাকি তার কল্যাণ।

দিদি বললেন, "তোমরা ছেলেরা মেয়েদের দিক থেকে ভাবতে পারো না। মেয়েরা দ্বিজ হয় যখন বাপের ঘর থেকে স্বামীর ঘরে যায়। তাদের বিবাহই তাদের উপনয়ন। স্বামী হয়তো পর হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর ঘর তা বলে পরের ঘর হয়ে যায় না। স্বামীর ঘর হচ্ছে নিজের ঘর। নিজের ঘর কেউ কখনো ছাড়ে? তোমরা একালের লেখকেরা মেয়েদের যে সব মন্ত্রণা দিচ্ছ সে-সব শুনলে আমার রাগ ধরে। ঐ যে কী ওর নাম! সেন গো সেন! বদ্যির ছেলের মতো নাম।"

"নরেশ সেন?"

"না, না। বিলিতী বদ্যি। মনে পড়েছে। ইবসেন। মুখপোড়া একটা নাটক লিখেছে। স্বামীর ঘর নাকি পুতুলের ঘর। মেয়েটা চলে গেল স্বামীর ঘর ছেড়ে। স্বামী দোষ করেছে, তা বলে স্বামীর ঘর কী দোষ করল শুনি! তোমাদের সব উলটো বিচার। রবি ঠাকুরকে আমি মুনি ঋষি বলে জানতুম। তিনিও শেষ কালে 'স্ত্রীর পত্র' লিখলেন। তোমরা ছেলেরা মেয়েদের দিক থেকে ভাবতে পারো না। তাই এমন সব দাওয়াই বাতলাও যা রোগের চেয়েও মারাত্মক।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, আভা তো ছেলেমানুষ নয়। সে নিজেই স্থির করুক কিসে তার মঙ্গল, কোন্ পথে গেলে শুভ।"

"সে আমার জানাই আছে। যেখানেই যাক স্বামীর সঙ্গেই তাকে যেতে হবে। স্বামীর সঙ্গে থাকতে হবে। স্বামীর চরিত্রের যাতে উন্নতি হয় তা করতে হবে। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর মুক্তি? ইবসেনের মুখে আগুন।"

ইবসেন আমার প্রিয় লেখক। তখনকার দিনে আমরা সবাই তাঁর কাছে কিছু না কিছু ঋণী ছিলুম। দিদির কিন্তু তাঁরই উপর রাগ। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি ক্ষমা করবেন না। আমার সঙ্গে তা হলে তাঁর কোন্ সূত্রে মিলবে!

বললুম, "দিদি, আপনি আভার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমিও তাই। কিন্তু আপনি কিম্বা আমি তার মতো বিপদে পড়িনি। কাজেই আমাদের পরামর্শ চোখ বুজে মেনে নেওয়া তার পক্ষে অনুচিত। সে তার নিজের দিক থেকে বিবেচনা করে দেখুক। হয়তো আপনার পরামর্শই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে।"

তিনি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। তার পরে কী মনে করে হাসলেন। "তোমরা এ কালের ছেলেরা মেয়েদের যতটা স্বাধীনতা দিতে চাও ততটা তাদের সইলে তো! তুমি ভাবছ দিদিটা কী রক্ষণশীল! আভাকে এইটুকু স্বাধীনতা দিতে চায় না যে, সে তার নিজের পথ বেছে নেবে। না বাপু। দিদি তেমন রক্ষণশীল নয়। দিদিও স্বাধীনতার পক্ষপাতী। কিন্তু যেখানে সামান্য ভুল করলে পরম সর্বনাশ, সেখানে ভুল করার স্বাধীনতা নিজের ছোট বোনকে দিতে তুমিও রাজী হবে না, প্রিয়দর্শন।"

এর পরে আর কথা চলে না। আমি জানতে চাইলুম, "তা হলে আমাকে কী করতে হবে, দিদি?"

"তা কি তোমাকে এক বার বলেছি? আবার বলি; শোন। কুমারকে বলে শিবুর ম্যানেজারিটা ঘুচিয়ে দাও। যদি তোমার মুখে বাধে

তা হলে নাপিতকে দিয়ে বলাও। তাও যদি না পারো, কুমারকে কলকাতা নিয়ে চলো, সেখানে আর কাউকে দিয়ে বলাব। এইটেই একমাত্র পথ। আর যেটাকে পথ বলছ সেটা বিপথ।"

আমি আমার মনঃস্থির করেছিলুম। সাফ বলে দিলুম, "আমাকে দিয়ে হবে না, দিদি। আমি কিছুতেই পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারব না। তার চেয়ে নিজে ইস্তফা দিয়ে সরে যাব। কুমারের সঙ্গে দেখা হলে বলব, আমাকে ছুটি দিন। আমার বদলে অন্য লোক নিন।"

"ওমা! তুমি ইস্তফা দেবে কোন্ দুঃখে! তোমাকে যেতে বলছে কে!"

"না, দিদি। ও রকম একটা দুর্জনের সঙ্গে একই সেরেস্তায় কাজ করতে পারব না। আমি তো ওর সহধর্মিণী নই যে ওর দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত থাকব।"

"সেইজন্যেই তো বলছি ওটাকে সরাও।"

"আমি সরাবার কে। জমিদারী কি আমার নিজের! যার জমিদারী, সে-ই হয়তো একদিন সরাবে। তার আগে আমি সরে যাব স্বেচ্ছায়। দিদি, আপনি আমাকে সর্পাঘাত থেকে বাঁচালেন। সাপের সঙ্গে বাস করছি এ জ্ঞান আমার ছিল না। চিঠিগুলো পড়ে এই উপকারটুকু হলো। আভার দুঃখ দূর করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু এ রাজ্যে আমি আর থাকছিনে।"

দিদি ক্ষুণ্ন হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার দোষে তোমার চাকরিটা গেল। অথচ আমারও সুবিধা হলো না।"

দিদিকে বিদায় দিয়ে আমি আমার তল্পিতল্পা গুটানোর যোগাড় করলুম। তার পরে একদিন কুমারকে গিয়ে বলব যে আমার ছুটি চাই। আপাতত হাওয়া বদলের জন্যে পুরী, তার পরে কাজকর্মের সন্ধানের জন্যে

কলকাতা। পুরী যাব শুনে মাসীর মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু আমার মুখ তেমনি ফ্যাকাশে।

দানবের সঙ্গে লড়াই না করে চলে যাচ্ছি। তার কবলে ফেলে যাচ্ছি একটি অসহায় মানবীকে। কে জানে কী আছে বেচারির কপালে! মনটা হুহু করতে থাকল। গোটা কতক কবিতা লিখে কিছুটা শান্তি পেলুম। কবিতা আজ আমার ডাক শুনে আসে না। তখনকার দিনে ডাকলেই আসত। আমার মাথায় শান্তির হাত বুলিয়ে দিত। আমার একমাত্র প্রিয়া।

কুমারের সঙ্গে দেখা করতে যাব এমন সময় একখানা চিঠি এলো আমার নামে। ডাকের চিঠি। কিন্তু স্থানীয় ডাকঘরের মোহর দেওয়া। খুলে দেখলুম—আভা। সে কেমন করে জানতে পেরেছে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে লিখেছে, আমি যেন অমন কাজ না করি। বলেছে আমি যদি ও কাজ করি তা হলে দেশের লোক আমার সেবা থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ আমি যে লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান। জনসাধারণ একজন বান্ধব হারাবে। কারণ আমি যে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। পুলিশের স্পর্দ্ধা বেড়ে যাবে, মহাকুম হাকিম ধরাকে সরা জ্ঞান করবে। আর ওই ম্যানেজার! কবি ও চেয়ারম্যান বলে আমার প্রতি ওর ভয়ডর ছিল। আমি চলে গেলে ওর ভয়ডর থাকবে না। কুমার তো খোসামোদের বশ। তিনি কিছু বলবেন না। তা হলে কত লোকের জীবন দুর্বহ হবে। সুতরাং আমি যেন যাওয়া বন্ধ করি।

আভার চিঠি। এ চিঠি আমি কল্পনায় প্রত্যাশা করিনি। চমৎকৃত হলুম। কিন্তু যাওয়া বন্ধ করা কি উচিত? এ রকম একটা দানবের সঙ্গে জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করব? আমার গায়ে কি তার পাপের দাগ লাগবে না? গবর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করব না বলে জেল

খাটলুম। ডাকাতের সঙ্গে সহযোগিতা করব। তবু আভাকে ওর কবলে ফেলে যেতে পা উঠছিল না। আভা আমার কেউ নয়। তা হলেও তার চিঠি থেকে মনে হয়, তার জীবন দুর্বহ হবে। আমার অবর্তমানে একটি মানুষের জীবন দুর্বহ হবে, আমি লোকটা এত গুরুত্ব-সম্পন্ন! তাই তো!

দিদি ওদিকে তলে তলে কলকাটি টিপছিলেন। একদিন কুমার আমাকে ডেকে পাঠালেন। চুপি চুপি জানতে চাইলেন, কুড়ুলকাটি ডাকাতীর মামলায় হাবু শেখ যে স্বীকারোক্তি করেছে তাতে আমার নাম করেছে কি-না।

আমি লাফ দিয়ে উঠলুম। "আমার নাম!"

কুমার বললেন, "হাঁ। তোমার নাম।"

আমি পাগলের মতো বললুম, "আপনি ভুল শুনেছেন। আমার নাম নয়। আপনার গুণধর ম্যানেজারের নাম।"

কুমার অবাক হলেন। আমি বলে গেলুম, ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যা কিছু শুনেছিলুম। তবে তার পারিবারিক জীবন বাঁচিয়ে। কুমার আমাকে বিশ্বাস করতেন। আমি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোনোদিন আমি পরনিন্দা করিনে। ম্যানেজার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেল। তিনি উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। কী করবেন স্থির করতে না পেরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এ ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কী?"

আমি ওকথা ভেবে দেখিনি। বলতে পারলুম না কী তাঁর কর্তব্য।

তিনি বললেন, "ওকে আমার কলকাতার সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দিয়ে এখান থেকে বদলি করি। কী বলো?"

আমি বুঝতে পারলুম, এর পরের প্রস্তাব আমাকে ম্যানেজার হতে বলা। চুপ করে শুনে যেতে থাকলুম।

"কিন্তু তুমি কি ম্যানেজারের কাজ চালাতে পারবে, প্রিয়দর্শন ? আর দু-এক বছর পরে তোমাকেই ম্যানেজার করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে ?"

ম্যানেজার হতে আমার লেশমাত্র স্পৃহা ছিল না। বললুম, "আমিও তার জন্যে প্রস্তুত নই। ও কাজের জন্যে অন্য লোক খুঁজতে হবে, কুমার।"

তিনি চিন্তিত হলেন। সেদিন আর কোনো কথাবার্তা হলো না। বাড়ী ফিরতে ফিরতে আমার মনে অনুতাপ জন্মাল। কেন করতে গেলুম পরনিন্দা। সত্যি-মিথ্যা নিজে পরখ করে দেখিনি। যদি অবিচার করে থাকি তবে তার প্রতিকার কী! আর ওই রাক্ষসটা যদি জানতে পায় আমি ওর নামে কী লাগিয়েছি, ও কি আমাকে আস্ত রাখবে!

পরে বোঝা গেল দিদির কারসাজি। তিনিই কুমারের কানে আমার বিরুদ্ধে ও-কথা বলার জন্যে চর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। চাকরি গেল না আমার, কিন্তু বদলির হুকুম হলো ম্যানেজারের। কলকাতা বদলি শুনে ম্যানেজার মহা খুশি। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ঝরল। কিন্তু ভাণ করল দুঃখের। প্রার্থনা জানাল যেন কলকাতার বাড়ীর একটা অংশ ওকে ভোগ করতে দেওয়া হয়। কুমার রাজী হয়ে গেলেন।

দিদি আর একবার এসেছিলেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে, আমার কাছে মাফ চাইতে। বললেন, "তুমি আমার যে উপকার করলে আমি তা কোনো দিন ভুলব না। তুমি যশস্বী হবে। কিন্তু আমি তোমার যে অপকার করলুম সেটা তুমি ভুলে যেও। তাতে তোমার ক্ষতি হলো না কিছু। তুমি থেকে গেলে।"

ব্যাপারটা অত সহজে চুকে গেল বলে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু এর পরে যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। ম্যানেজার যাবার আগে

সত্যিই একজনকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাল। তাতে আমার নাম ছিল। আমি নাকি মদ খাই, মেয়েমানুষ রাখি, চোরাই মালের কারবার করি। মহকুমা হাকিম আমাকে তলব করলেন তাঁর বাংলোয়। বললেন, "আপনার মতো লোকের নামে এসব বিশ্রী উক্তি শুনে আমাদের শুদ্ধ মাথা কাটা যায়। কী করি! রেকর্ড না করে পারিনে। যা'হোক, আমি থাকতে আপনার অনিষ্ট হবে না। কিন্তু কাজ কী আপনার পাঁচজনকে শত্রু করে? জায়গাটা বেয়াড়া, লোকগুলো ছুঁচো, আমি বলেই টিকে আছি এখনো। জানেন, মশাই, আমার আগে যাঁরা এস. ডি. ও. হয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই অপমান হয়ে বদলি হয়েছেন! কিম্বা বদলি হবার সময় অপমান হয়েছেন!"

মহকুমা হাকিম নথিপত্র ধামাচাপা দিলেন, কিন্তু খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আমি বাড়ী থেকে বেরোনো বন্ধ করলুম। মাসী বললেন, "চল, পুরী চল। এখানে আর এক দণ্ড নয়। আমি তোর মাসী। আমাকে তোর সঙ্গে জড়ায়! আমি বিষ খেয়ে মরব।"

ম্যানেজার তো গেলই, আমাকেও যেতে বাধ্য করল। চাকরিটা গেল আমারই, তার নয়। সে কুমার বাহাদুরের কলকাতার বাড়ীর এক অংশে গুছিয়ে বসল। কুমারের কলকাতার গাড়ী চড়ে থিয়েটার দেখে বেড়ালো। কোন এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তার রসের সম্পর্ক গড়ে উঠল। আর আমি! আমি চোরের মতো কুমারের সেরেস্তা থেকে ছুটি নিয়ে সেই যে সরে পড়লুম আর ওমুখো হলুম না। কুমার আমাকে বার বার চিঠি লিখেছিলেন। আমি ফিরে যাইনি। কয়েক বছর খবরের কাগজে কাজ করার পর আবার উত্তর বঙ্গের টানে কলকাতা ছাড়লুম। কিন্তু আর ও জেলায় নয়। যদিও ওর সঙ্গে আমার প্রথম দর্শনে প্রেম।

প্রিয়দর্শনদার কাহিনী শেষ হলে আমি তাঁকে আমার সহানুভূতি জানিয়ে বললুম, "তারপর আভা দেবীর কী হলো কিছু খবর রাখেন?"

তিনি নিস্পৃহের মতো বললেন, "সে_ সব অনেকদিনের কথা। আভা আমাকে দেখবে বলে বায়না ধরেছিল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, পা ধ'রে মাফ চাইবে। আমি তার চিঠির জবাব দিইনি। দিদিও চিঠি লিখে চাকরির প্রস্তাব করেছিলেন। আমি সে চিঠি দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি। আভার চিঠি কিন্তু আমার কাছে তোলা রয়েছে। বেচারি আভা!"

"আশা করি, পরে তিনি সুখী হয়েছেন।"

"সুখী হয়েছে কি না, ভগবান জানেন। এক বার ওর ছেলেকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে। ছেলে তখন কলেজে পড়ে। আমার অটোগ্রাফ চায়। ফোটোগ্রাফ তুলে নিয়ে যায়। শুনলুম তার বাপ অনেক টাকা করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। বালিগঞ্জে নিজের বাড়ী। আর তার মা কলকাতার গরম সহ্য করতে পারে না। বছরের মধ্যে ছ'সাত মাস পুরীতে কাটায়। ও নাকি আশা করে যে পুরীতে একদিন আমার দেখা পাবে। ফোটো থেকেই চিনবে। আমার পায়ের ধুলো না নিয়ে তার শান্তি নেই।"

প্রিয়দর্শনদার চোখে জলের রেখা। বললেন, "গেছলুম পুরী।"

"গেছলেন?" আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "দেখলেন?"

"দেখলুম।" প্রিয়দা চোখ মুছে বললেন, "সুন্দর মেয়ে আভা। আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। কত কথা বলার ছিল। বলতে পারল না। কাঁদল। আমিও বলতে চাইলুম দু'এক কথা। পারলুম না। কাঁদলুম। তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলুম। মনে মনে বললুম, না। না। না। এক টুকরো কাগজে ঐ মন্ত্র লিখে দিলুম।"

"তার মানে?"

"তার মানে?" প্রিয়দা দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "তার মানে, হার মানবে না। আত্মসমর্পণ করবে না। সহ্য করবে না।"

"তার পর ?"

. "তার পর আর কী ? চিঠিপত্র মাঝে মাঝে পাই। চিঠির সুরে হতাশা। বলে, তুমি যে মন্ত্র দিয়েছ তা প্রাণপণে জপ করছি। কিন্তু পেরে উঠছি কই ? আমি যে অবলা।"

"আর দেখা হয়নি ?"

"পরে বলছি। কিন্তু আমার বাণী যা ছিল তা তো একটি অক্ষরে ব্যক্ত করেছি। কেউ যদি পালন করবার শক্তি পায় তাহলে দেখবে ঐ একটি শব্দের শক্তি অসীম। তখন সে আর অবলা বলে করুণা ভিক্ষা করবে না। অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠবে। আমি যে নারীর ধ্যান করি সে পূর্ণ প্রজ্বলিত বহ্নি। সে আছে প্রতি নারীর অন্তরে। সে তো অবলা নয়।"

প্রিয়দা ক্ষণকাল নীরব থেকে বন্দনার মতো গেয়ে উঠলেন, "কে বলে, নারী, তুমি অবলে! তুমি মহাশক্তিমতী। তুমি মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। তুমি তারায় তারায় দীপ্তিমতী, তুমি উষসী, তুমি সবিতা। তুমি বিদ্যা, তুমি বাক্। তুমি চিন্তা তুমি, কীর্তি। তুমি কবিতা, তুমি গীতি। তুমি বাঁশরি, তুমি বীণা। হে নারী, তুমি ধন্যা।"

দাদা ধ্যানস্থ হলেন। তাঁর ধ্যানের পরশ পেলুম আমিও।

এই ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল। দাদা বললেন, "যার কথা হচ্ছিল তার কথাই হোক। আভার কথা।"

"আর কারো কথা ভাবছিলেন নাকি ?"

"একসঙ্গে অনেকের কথা। দেখতে অনেক। আসলে এক। জগতে একটি নারীই আছে। চিরন্তনী নারী। তারই ধ্যান করছিলুম আমি। তার বিভিন্ন রূপ। বিচিত্র নাম। সব একসঙ্গে এসে চোখের সামনে ভাসছিল। তাদের ঘিরে বিরাজ করছিল একটি নারী, একমাত্র নারী।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। মনে হচ্ছিল আমিও যেন তাকে দেখতে

পাচ্ছি। সেই নারীকে, যে সব নারী অথচ এক নারী। এক নারী হয়েও সব নারী।

"আভার কথা বলছিলুম। না? আচ্ছা, তার পরে কী হলো শোন। এক দিন কলকাতা গেছি। আভার ছেলে এসে আমাকে খবর দিল তার মা'র অসুখ। আমাকে দেখতে চায়। বেলা তিনটের সময় আমি যেন তাদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে যাই। তার বাবা সে সময় থাকবেন না। তাঁর ফিরতে রাত হবে। আমি অনেক বার এড়িয়েছি। এবার এড়াতে পারলুম না। অসুখ শুনে উদ্বেগ বোধ করছিলুম। পরের অসুখ শুনলে আমার মন কেমন করে।"

"তার পর?"

"তার পর যেতে যেতে চারটে বাজল। বোধ হয় অবচেতন মন দেরি করিয়ে দিচ্ছিল। শিববাবু কী মনে করবেন! তাঁর অবর্তমানে তাঁর সংসারে অনধিকারপ্রবেশ। কিন্তু অপমান যা করবার তা তো করে রেখেছিলেন। নতুন আর কী করতেন! তার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়ে গেছলুম। আভার ছেলে মুকুল আমাকে সোজা নিয়ে গেল অন্দরে, তার মা যেখানে রোগশয্যায়। দেখে বুঝতে পারলুম যে এ রোগ এক দিনের নয়, এক দিনে সারবে না। শুনলুম অনেক দিন ভুগছে। সরু সরু দু'খানি হাত তুলে আমাকে নমস্কার করল। বলল, পায়ের ধুলো নেবার শক্তি নেই। মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলুম। বেশ জ্বর। বললুম, সেরে উঠবে। ভয় নেই!"

আমার জানতে ইচ্ছা করছিল সেরে উঠল কি না। কিন্তু চুপ করে শুনতে থাকলুম।

"আভা বলল, ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে! মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি আসছে মাঘ মাসে। ছেলে তো বিলেত যাবে বলে জেদ ধরেছে। আই. এ. পাস করেই আই. সি. এস. পড়বে। আমি তা হলে থাকব কী নিয়ে?

কাকে নিয়ে? এত দিন সব সহ্য করেছি ওদের মুখ চেয়ে। ওরা চলে গেলে সহ্য করব কার মুখ চেয়ে? ঠাকুর দেবতা আমি মানিনে। ভগবান আছেন কি না জানিনে। দেশের কাজ করতে সাধ যায়। কিন্তু ঘরে বসে তো ও কাজ করা যায় না। তার জন্য বাইরে যেতে হয়। যেতে দিচ্ছে কে? বই পড়ে কিছু বল পাই। কিন্তু বই পড়ে তো অন্তরের শূন্যতা ভরে না। খই খেয়ে কি পেট ভরে!"

শুনতে শুনতে আমার চোখ ছল ছল করছিল। বলতে বলতে দাদারও।

"আমার তো বাণী বলতে ঐ একটি অক্ষর। তার উপর আর কিছু বলবার ছিল না। আভার মাথায় হাত রেখে মনে মনে জপ করতে থাকলুম, না। না। না। না। না। না। না। আমার মনের কথা তার মনে পৌঁছাচ্ছিল ঠিক। আমি টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করি। সে বলল, তোমার মন্ত্র আমি দিনরাত জপ করছি। কিন্তু ওতে বেঁচে থাকার প্রেরণা পাচ্ছিনে। ওটা কি জীবনের মন্ত্র? না, মরণের? আমি বললুম, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে পারলে জীবনের। নয়তো মরণের। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আত্মসমর্পণ করা চলবে না। আভা বলল, কিন্তু আমি যে পারছিনে গো। আমি বললুম, আমি তোমাকে অন্তরে অন্তরে বল দিচ্ছি, যেমন বাবর দিয়েছিলেন হুমায়ুনকে তাঁর আয়ু। সে বলল, তুমি তোমার নিজের জন্যে কিছু রাখছ না? আমি বললুম, আমি এ বিষয়ে বেহিসাবী। দিতে দিতে বল যেমন ফুরোয়, তেমনি অন্য কোনো উৎস থেকে আসে। আমি ভগবান মানি।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, "আপনি কি এমনি করে নিজের আয়ু খরচ করে বসে আছেন, দাদা! ভগবান যদি না থাকেন!"

"না থাকলে আমার পরমায়ু বেশি দিন নয়। কিন্তু তার জন্যে আমার

আফসোস নেই। আমি শুধু জানতে চাই যে, সংগ্রাম অবিরাম চলছে, সেনাপতি যেমন জানতে চায় যে সৈনিক প্রাণপণে যুঝছে। যুঝতে যুঝতে যদি মরে যায় তো দুঃখ নেই। দুঃখ, যদি আরামের লোভে আপোশ করে। যাক, কী বলছিলুম। আভা আমাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না। সমস্তক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। এক রাশ খাবার নিঃশেষে খাওয়াবে। যতই বলি, এবার আমাকে যেতে হবে, ততই বলবে, না, না, এই তো এখুনি এলে। এরই মধ্যে যাবে! ওদিকে অবচেতন মন আমাকে ঠেলছিল আর তাড়া দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতল। পাঁচটা বাজল দেখে হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। চোখে চোখে বললুম, ফাইট।"

এর পরে আর একটি কথা জানবার ছিল। দাদা অনুমানে বুঝলেন। বললেন, "বেঁচে আছে। কিন্তু পারেনি। আবার মা হয়েছে।"

অব্যক্ত বেদনায় তাঁর মুখের ভাব বিকৃত হলো। আমিও মুখ নীচু করলুম।

দু'জনেই আমরা অভিভূত। বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদা। শুনতে শুনতে আমি। কে কাকে সহানুভূতি জানাবে! চেষ্টা করলুম দু'এক কথা বলতে। মুখে জোগাল না। তাঁর দুই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিলুম।

তিনি চোখের জল মুছে বললেন, "ভালো থাকুক আভা। যাতে ওর মঙ্গল হয় তাই হোক। আমার কিন্তু কোনো সান্ত্বনা নেই। আমার দৃষ্টিতে যে মেয়ে হার মানে সে পতিতা।"

আমি চমকে উঠলুম। কী বললেন! কী!

"থাক, তোমার মনে আঘাত দিতে চাইনে। যা বলেছি তা ফিরিয়ে নিচ্ছি, ভাই। ক্ষমা করো।"

কথাটা আমার মনে আজ অবধি খচ্ খচ্ করছে। তখন আমাকে কী পরিমাণ ঘা দিয়েছিল তা এর থেকে আন্দাজ করতে পারা যাবে!

দাদা বললেন, "যাক, এ প্রসঙ্গ আর নয়। এই শেষ।"

আমি বললুম, "আচ্ছা।"

কিছুদিন পরে পাটনায় আমার ডাক পড়ল সাহিত্য-সভায় ভাষণ দিতে। দাদাকে খবর দিতে তিনি বললেন, "নিশ্চয় যাবে।"

আমি বললুম, "যেতে ইচ্ছা করছে না। জীবনে যা করতে এসেছিলুম তা করা হয়নি। হাতের কাজ হাতে রেখে লোকের সামনে দাঁড়াব কোন্ লজ্জায়।"

"তোমার তো দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। ও কথা তোমার বেলা খাটে না। খাটে আমার বেলা। আমাকে কিন্তু আজকাল কেউ ডাকে না। তিনি বিষণ্ন স্বরে বললেন।

এই নিয়ে আলোচনা হতে হতে এক সময় তিনি বলে ফেললেন, "পাটনায় কে থাকে, জানো? কুসুমিতা।"

"কুসুমিতা!" আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

"কুসুমিতা। সুমিতা। মিতা। তিনটে নাম ঐ একটি মেয়ের।" দাদা অতীতের স্রোতে অবগাহন করতে করতে তলিয়ে গেলেন।

"সুন্দর নাম।" আমি কতকটা আপন মনে বললুম।

"কী বলছ? হাঁ, সুন্দর নাম। দেখতে কিন্তু তেমন সুন্দর নয়। আভার কাছে লাগে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি তেজস্বী। ঝকঝকে তলোয়ারের মতো গড়ন। তেমনি দীপ্তি। ও মেয়ে পথ ভুলে বাংলাদেশে জন্মেছে। রাজপুত হলে মানাত।"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে পাটনার কথায় সুমিতার কথা এসে পড়েছে। এখন সুমিতার কথাই চলছে। তাই পাটনার উল্লেখ না করে চুপ করে থাকলুম।

"ওর সঙ্গে অনেক দিন আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই। চিঠি লেখাও বন্ধ।" দাদা বললেন।

"জানিনে কেমন আছে। দেখতে কেমন হয়েছে। কাগজে পড়েছিলুম ওরা পাটনায় বদলি হয়েছে। ওর স্বামী ওখানকার বড় অফিসার।"

আমার জানতে ইচ্ছা ছিল নাম ধাম পদ, কোনো এক ছলে আলাপ করে আসতুম। কিন্তু দাদার ইচ্ছা ছিল না জানাতে। তিনি ঐ ভদ্রলোকের উপর আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তৃতীয় নয়ন দিয়ে ভস্ম করতেন, যদি পারতেন।

"মাঝে মাঝে যে ভূমিকম্প হয় তার কারণ কী জানো! বসুমতী আর সহ্য করতে পারেন না এই সব পাপীদের ভার। আমার তো বিশ্বাস, বেহার ভূমিকম্পের আসল কারণ পাটনায় ঐ লোকটার বদলি।"

আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। দাদা খাপ্পা হয়ে বললেন, "একথা গান্ধীজীর মুখে শুনলে হাসতে?"

গান্ধীজীর উপর সে সময় আমি খুব প্রসন্ন ছিলুম না তাঁর মুখে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা শুনে। বললুম, "আচ্ছা, হাসি বন্ধ করছি। তা বলে বেহার ভূমিকম্পের আসল কারণ সুমিতার স্বামী—না, দাদা, হাসি থামছে না।"

দাদা আবার অন্যমনস্ক হলেন। কখন এক সময় আপনা থেকেই বলতে শুরু করে দিলেন সুমিতার কাহিনী। তাঁর আত্মজীবনীর আর এক অধ্যায়।

কুমার রাধিকামোহনের সেরেস্তার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতা চলে যাই, বলেছি তোমাকে। কলকাতায় আমার না ছিল চাল, না ছিল চুলো। থাকবার মধ্যে ছিল জনকয়েক অকৃত্রিম বন্ধু। তারা আমাকে লুফে নিল। তাদের একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, চলছিল কোনো মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমাকে ধরে বসল আমি যেন তার সম্পাদনার ভার নিই। গদ্য লেখার অভ্যাস কোনো কালে ছিল না। কিন্তু হাতে যখন একখানা পত্রিকা এলো তখন দেখা গেল গদ্য আপনি আসছে। জ্বালাময়ী ভাষায় প্রাণ খুলে লিখতুম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, মনুর শাসনের বিরুদ্ধেও। লোকে দাম দিয়ে আমার কবিতার বই কিনত না, কিন্তু পত্রিকা কিনত। আমার লেখার দাম আছে তা এই প্রথম আবিষ্কার করলুম। প্রথম আবিষ্কারের পুলক আমাকে পাগল করে তুলল। কী যে লিখে যাচ্ছি তার মানেও সব সময় বুঝিনে। বুঝতে বাধ্য হই যখন পুলিশের লোক শাসিয়ে যায় যে, এইবার জামানত তলব হবে। তখন সংযত হই।

এই নিয়ে আছি এমন সময় এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি প্রৌঢ়-গোছের লোক এলো। লোকটি ঘরে ঢুকে একবার এদিকে তাকায়,

একবার ওদিকে। জানলার কাছে গিয়ে দেখে কেউ বাইরে থেকে আড়ি পাতছে কি না। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারে, কেউ বাইরে থেকে আসছে কি না। আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, "বসুন ঐ চেয়ারে। বলুন কোন্‌খান থেকে আসছেন। লালবাজার, না, ইলিসিয়াম রো।"

লোকটি অপ্রস্তুত হলো। বুঝতে পারলুম পুলিশের লোক নয়। একটু ইতস্তত করে আমার হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিল। তার পরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কড়িকাঠ গুনতে লাগল। চিঠিখানা খুলে দেখি মেয়েলি হাতের লেখা। যিনি লিখেছেন তাঁর নাম সম্পূর্ণ অজানা। অথচ নীচে লিখেছেন, স্নেহের বোন সুমিতা। পড়ে দেখলুম, আমার সঙ্গে তাঁর কী যেন জরুরি কাজ আছে। আমি যেন তাঁর সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করতে যাই। কলকাতায় তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এসেছেন। বলতে গেলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই আসা। আমি যেন তাঁকে নিরাশ না করি। তাঁর যা বলবার আছে তিনি মৌখিক বলবেন। এই লোকটি তাঁর ঠিকানা জানাবে।

চিঠি পড়া শেষ করে লোকটির দিকে তাকালুম। লোকটি বলল, "দিদিমণি কী লিখেছেন আমি জানিনে। তবে আমার উপর ভার দিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার। কখন আপনার সময় হবে জানলে আমি নিজে এসে নিয়ে যাব।"

আমি তাকে প্রশ্ন করে বিশেষ কিছু বার করতে পারলুম না। সে যা বলল তার থেকে মনে হলো মহিলাটির খুব লেখার ঝোঁক। দিন রাত লিখছেন তো লিখছেন। কেউ তাঁকে শিখিয়ে দেয় না কেমন করে লিখতে হয়। সেইজন্যে তাঁর লেখা ছাপা হয় না। আমি যদি একটু দেখিয়ে দিই তা হলে তিনি তাঁর রচনা প্রকাশ করতে দেবেন।

আমি বললুম, "তিনি যদি কিছু লিখে থাকেন আমাকে পাঠালে আমি

শুধরে দিয়ে ছাপতে পারি। এর জন্যে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে কেন ?"

"আজ্ঞে, তাঁর যদি উপায় থাকত তিনি নিজেই আসতেন আপনার কাছে। কিন্তু সে কথা আমার বলা বারণ। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে খরচ যা লাগবে তিনি দেবেন। কিন্তু যাওয়া আপনার চাই-ই। নইলে তিনি হয়তো—"

"হয়তো কী ?"

"সে সব আমার বলা বারণ। তার শরীর মোটেই ভালো নয়, কখন কী করে বসেন কে জানে। আমরা তো ভয়ে ভয়ে আছি।"

আমি লোকটা যে এমন দরকারী লোক তা আমার জানা ছিল না। তবু কথা দিতে পারলুম না যে দেখা দেব।

লোকটি অনেক অনুরোধ উপরোধ করল। তার সঙ্গে কথা বলে যত দূর বুঝতে পারলুম মহিলাটি কলকাতা এসেছেন চিকিৎসার জন্যে। উঠেছেন ছোট বোনের বাড়ী। লোকটি ছোট বোনের শ্বশুরকুলের আশ্রিত। প্রকাশ্য পরিচয় সরকারবাবু। পরের বাড়ীতে গিয়ে অপরিচিতার সঙ্গে দেখা করা কী করে সম্ভব। এ কথার উত্তরে সে বলল, "আপনি তো পর নন। আপনি দিদিমণির দাদা। আপনার নাম শরৎবাবু।"

মিথ্যার আশ্রয় নিতে আমার অন্তরের আপত্তি ছিল। সে বলল, "মিথ্যা যা বলার তা আমিই বলব। আপনাকে বলতে হবে না। আপনি আমার মুখের দিকে তাকাবেন। আমি আপনার নামধাম নাড়ি-নক্ষত্র জানাব। তার পর একবার দিদিমণির সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ হলে আর কেউ সেখানে আসবে না। আমি পাহারা থাকব।"

এমন চমৎকার একটা য়্যাডভেঞ্চার আমার সামনে। ক্ষতি কী, যদি যাই এই লোকটির সঙ্গে ? কিন্তু কথা দিতে আমি রাজী হলুম না। মনে

হলো, না। কাজ নেই আমার ম্যাডভেঞ্চারে। শরৎবাবু সেজে কোন অন্ধকার গলিতে কার দালানে ঢুকব, সেখানে যদি আমাকে আটক করে রাখে তা হলে উদ্ধার করবে কে আমাকে? কে জানে কার মনে কী আছে?

বললুম, "দেখুন, আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। মিথ্যার অভিনয় করতে আমি কিছুতেই রাজী হব না। আমার যা সত্য পরিচয় সেই পরিচয় বহন করে যদি আমার যাওয়া সম্ভব হয় তা হলে যেতে পারি কি না ভেবে দেখব।"

সে বলল, "তা হলে যা হয় একটা উত্তর দিন। আমি যদি খালি হাতে ফিরে যাই দিদিমণি আমার মুখদর্শন করবেন না। তাঁকে আমি কী সান্ত্বনা দেব? আপনার কি দয়ামায়া নেই? বড়ঘরের বৌ, বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকছেন, আপনি কি সাড়া দেবেন না-? তা হলে ওসব বইকাগজ লেখেন কেন? টাকার জন্যে? কত টাকা চান?"

আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল টাকার কথা শুনে। লোকটার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালুম যে সে চোখ বুজে দু'হাতে মুখখানা ঢাকল। তাড়াতাড়ি একটুকরো কাগজের উপর আমার বক্তব্য লিখে দিলুম। লোকটা তাই নিয়ে বিদায় হলো।

দেখ দেখি কী জ্বালা! সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় রচনা লিখি বলে পাঠিকারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন, না গেলে বলে পাঠাবেন, কেন লেখেন? টাকার জন্যে? কত টাকা চান? ম্যাডভেঞ্চারের শখ যেটুকু আমার ছিল এই অশিষ্ট উক্তির পর কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি নিজের কাজে মন দিলুম। ভুলে যেতে চাইলুম যে সুমিতা বলে কেউ আমাকে দেখতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। কিন্তু ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়। জীবনে এ ধরনের ডাক কদাচ আসে। কেন ডেকেছে, কী বলতে চায়, কী বিপদ, কী করতে পারি,

এসব প্রশ্ন একে একে উদয় হতে লাগল। যে মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধার করতে হবে, পৌরুষের প্রথম কথা হচ্ছে এই। মধ্যযুগের নাইটদের এই ছিল জীবনব্রত। আমরা এ কালের লেখকেরা কেবল কলম চালাতে জানি। তাও পত্রিকায় জামানত বাঁচিয়ে। অচেনা মানুষ দেখলেই গোয়েন্দা ঠাওরাই। অজানা জায়গায় যাবার নাম শুনলে ভাবি, ফাঁদ পাতা রয়েছে। আমি প্রিয়দর্শন ভদ্র আর পাঁচজনের চেয়ে বড় কিসে?

তা বলে শরৎবাবু সেজে অন্ধকার গলিতে কে জানে কার বাড়ীতে ঢুকে বোনকে দেখতে চাওয়া! এ যে রীতিমতো নাটক! এর জন্যে আমি প্রস্তুত নই। যদি ধরা পড়ে যাই তো পরের দিন কাগজে বেরোবে কবি ও সম্পাদক প্রিয়দর্শন ভদ্র পরের অন্তঃপুরে অনধিকার প্রবেশ করে প্রহৃত হয়েছেন। অবস্থা আশঙ্কাজনক। হরি, হরি!

ভেবেছিলুম ব্যাপারটা চুকে গেছে, সুমিতা আর আমাকে জ্বালাতন করবে না। কিন্তু একদিন কি দু'দিন পরে দেখি দুটি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে কাকে খুঁজছে। আমাদের মতো নগণ্য বাংলা পত্রিকা কি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা পড়ে? কই, তাদের তো আমরা গালিগালাজ দিইনি। বা অন্য কোনো উপকার করিনি। কেন তা হলে তারা আমাদের আপিসে জুতোর ধুলো দেয়?

"ওয়েল, লেডিজ্, আপনাদের জন্যে আমরা কী করতে পারি?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"আপনার নাম কি মিস্টার বাডরা? আপনি কি ম্যানেজার?"

"আমার নাম ভদ্র। আমি এডিটর।"

"ওহ্। আপনাকেই আমরা খুঁজছি। এই নিন আপনার নামে চিঠি।"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মনে হলো পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যে

ইঙ্গভারতীয় সমাজের কোনো লেখক কিছু পাঠিয়েছেন। বাংলায় ভাষান্তরিত করতে হবে। কিন্তু খুলে দেখা গেল দিব্যি বাংলাভাষায় লেখা। লেখিকার নাম সুমিতা।

আমি তো অবাক। চিঠিতে সে আর এক বার অনুরোধ করেছে। আমি যেন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করি। তার স্বাস্থ্য ভালো নয়। নার্সের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নার্স দয়া করে তার পত্রবাহক হয়েছে। পত্রবাহকের হাতে যেন এক লাইন লিখে জানাই যে আমি রাজী। তার পরে যা করবার তা সরকারবাবু করবেন।

নার্স ও তার বান্ধবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হলো। তাদের ধারণা আমি সুমিতার সত্যিকারের দাদা। কোনো কারণে তার ওখানে যাচ্ছিনে। আমাকে তারা পুনঃপুনঃ অনুনয় করল আমি যেন আমার বোনের সঙ্গে দেখা করি। শুনলুম, সুমিতারা থাকে ল্যান্সডাউন রোডে। সেটা মোটেই অন্ধকার নয়। বরং আমিই থাকি অন্ধকার গলিতে। নিজে অন্ধকারে থাকি বলে অন্ধকার কল্পনা করছি। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স রাখতে পারে যে তার অবস্থা আমার চেয়ে বহুগুণ ভালো। বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ নিশ্চয়। আর আমি একজন চালচুলোহীন সাহিত্যিক। আমাকে তার প্রয়োজন। আমার ছেঁড়া জুতো আর আধময়লা ধুতি আর মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি দেখলেই তাদের বাড়ীর দারোয়ান সন্দেহ করবে। তবে হাঁ, সরকারবাবুর বন্ধু বলে পরিচয় দিলে বিশ্বাস করতে পারে।

বললুম, "আমার কি যাবার জো আছে? কাগজখানার পিছনে যথেষ্ট সময় না দিলে সেখানা চলবে না ভালো করে। ওয়েল, সিস্টার, আপনি তাঁকে দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন আমি দুঃখিত।" নার্সের বান্ধবীকে কিছু না বললে খারাপ দেখায়, তাই তাকে বললুম, "মিস্, আপনারা কষ্ট করে এসেছেন বলে আমি উৎফুল্ল।"

বান্ধবীটি মুখরা। সে বলল, "আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত, মিস্টার বাডরা। কেমনতর ভদ্রলোক আপনি, দু'জন মহিলা আপনার বাড়ী বয়ে এসে অনুরোধ জানাচ্ছেন, তবু আপনি তাঁদের মুখ রাখবেন না?"

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো যে মহিলাদের চা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমার আপিসের ভাঙা পেয়ালায় চা যদি বা দেওয়া যায় টোস্ট মাখন বিস্কুট কোথায় পাই! অগত্যা উঠতে হলো আমাকে। বলতে হলো, "আমি সত্যিই লজ্জিত। বিশেষ করে লজ্জিত এইজন্যে যে আমার আপিসে চায়ের আয়োজন নেই। আসুন আমরা বেরিয়ে পড়ি একটা চায়ের দোকানের সন্ধানে। মহিলাদের সম্মান রাখতে হবে।"

কাছাকাছির মধ্যে ভদ্রভাবে চা খাওয়া যায় শিয়ালদা স্টেশনের রিফ্রেশমেণ্ট রুমে। সেখানে নিয়ে গেলুম তাদের। ভাগ্য ভালো, কোনো পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলো না। নইলে জবাবদিহি করতে হতো। বিশিষ্ট লেখক প্রিয়দর্শন ভদ্র দু'পাশে দুই য্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা নিয়ে ইউরোপীয়ান রিফ্রেশমেণ্ট রুমে চা খাচ্ছেন, এটা একটা দেখবার মতো দৃশ্য। খদ্দরের পাঞ্জাবি, তিন দিনের বাসি কাপড়, শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়া জুতো। তবে হাঁ, সদ্য ক্ষৌরি করা গোঁপদাড়ি, ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ানো চুল। সাবান দিয়ে মুখ হাত ধোওয়া। প্রিয়দর্শন বোধ হয় অপ্রিয়দর্শন নয়। দশজনের মধ্যে একজন বলে চেনা যায়। এমনি কবিত্বময় তার চেহারা।

চা খেতে খেতে খুলে বললুম আমার অবস্থা। আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে না জেনেশুনে পরের বাড়ী যাওয়া। তাও হয়তো পারি, কিন্তু দাদা বলে পরিচয় দিতে পারব না। নাম বদলাতে পারব না। এ শুধু ধৃষ্টতা নয়, এটা হচ্ছে প্রতারণা।

নার্স বলল, "সত্যি তাই।"

বান্ধবী বলল, "ওহ্, আপনি একটি দেবদূত। তা আপনি স্বর্গে চলে যেতে পারেন, এই ধূলির ধরণীতে আপনাকে মানায় না।"

আমি এর উত্তরে কী বলব ভেবে পাইনে। নার্স বলে, "কিন্তু আমরা আপনাকে পীড়াপীড়ি করতে পারিনে। মিসেস—কে আমি বুঝিয়ে বলব।"

বান্ধবী বলে, "কী বুঝিয়ে বলবে? বলবে ইনি ভয়ে আধমরা। এমন পুরুষের উপর আমার করুণা হয়। পৃথিবীর অযোগ্য।"

দেখলুম ওরা উঠল। আমি বয়কে ডেকে বিল চুকিয়ে দিলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মুখ তুলে তাকাতে পারছিলুম না। অন্যমনস্ক ভাবে কখন এক সময় ওদের সঙ্গে "গুড বাই" বিনিময় করলুম।

তারপর আমার খেয়াল হলো যে সুমিতার চিঠির জবাব দিতে ভুলে গেছি। ততক্ষণে ওরা ট্রামে উঠে পড়েছে। বাড়ীর নম্বরটা জানা নেই যে লিখে জানাব। কিন্তু জানাবার আছে কী! সম্ভব নয় তা তো বলে দিয়েছি।

ভেবেছিলুম এই শেষ, কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখি একজন দারোয়ান গোছের লোক আমার মেসের ঠিকানায় হাজির। দিদিমণির কাছ থেকে চিঠি।

খুলে দেখি সুমিতা নার্সের মুখে আমার বক্তব্য শুনে আমার আপত্তির কারণ উপলব্ধি করেছে। আমাকে বাধ্য করতে চায় না। কলকাতায় আরো কিছু দিন থাকবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়। তার এখনো আশা আছে আমি একদিন রাজী হব। একদিন আমার আপত্তির খণ্ডন হবে। সে ধৈর্য ধরবে। আমাকে শোনাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। সে সব কথা চিঠিতে বলা যায় না। কে জানে কার হাতে পড়বে কোন্ দিন সে চিঠি।

এবার এর একটা উত্তর আমাকে দিতে হলো দারোয়ানের হাতে; বললুম, আমারও মনে হয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে একদিন। কিন্তু কোথায় কী ভাবে জানিনে। কাল নিরবধি। পৃথিবী বিপুল। দু-দশ বছর দেরি হলে ক্ষতি কী! দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনলেই তো আর দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করা যায় না। শক্তি অর্জন করতে হয়। সেটা সুমিতার হাতে।

দারোয়ান আমাকে একটা লম্বা সেলাম করে চলে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যে সুমিতাকে তার চিঠির জবাব দিতে পেরেছি।

ওর সঙ্গে সত্যি আমার দেখা হবে এত বড় দুরাশা আমার ছিল না। আমার কাগজের উপর সরকারের শনির দৃষ্টি পড়েছিল। আমার সহকারীকে ওরা গ্রেফ্‌তার করে বর্মায় পাঠিয়ে দেয় সুভাষের সঙ্গে। বোধ হয় ওরা জানত যে আমার যা-কিছু বিষ কলমের মুখে। গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই। সেইজন্যে আমাকে ধরেনি। তবে জামানত দাবি করেছে। জামানত দিয়ে আমাদের ক'জনের হাতে যা অবশিষ্ট ছিল তাতে পাওনাদারের বকেয়া মিটিয়ে নিজেদের অন্নবস্ত্র জোটে না। তার চেয়ে জেলে যাওয়া ভালো। সেখানে খাওয়া পরার ভাবনা নেই, পাওনাদারের ভয় নেই। জেলে যাওয়ার জন্যে আমরা ক'জন মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলুম। সেইজন্যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে সুমিতার দিকে নজর দিতে পারছিলুম না। সেও আমাকে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিয়েছিল।

এমন সময় আবার একদিন এলো সেই প্রৌঢ়মতন লোকটি। সরকার-বাবু যার পরিচয়। এবারেও তার সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি। নতুন কথার মধ্যে এই যে, সুমিতা আর বেশি দিন কলকাতায় থাকবে না। তার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আমি কি কোনো মতেই আমার মত বদলাতে পারিনে? একটি দুঃখিনী বোনের জন্যে আমার হৃদয়ে কি এতটুকু জায়গা

হতে পারে না? আমি যদি রাজী হই সরকারবাবু সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

জেলে যাবার জন্যে যে মানুষ তৈরি হচ্ছে তার পক্ষে একটি অপরিচিতা ভগিনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা এমন কিছু দুরূহ কর্ম নয়। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। সরকারকে বললুম, "তা হলে কী করতে হবে, সরকারদা?"

"আমি আপনাকে মোটরে করে নিয়ে যাব ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ীতে। আপনি বাইরে বসবেন। আমি ভিতরে খবর দেব। আমি যা বলব তার জন্যে আমি দায়ী, আপনাকে মিথ্যা কথা মুখে ধরতে হবে না। ভিতর থেকে ডাক আসবে একটু পরে। মিষ্টি মুখ করবেন। সে সময় পর্দাটা একটু সরিয়ে দিদিমণি আসবেন আপনার সামনে। প্রণাম করবেন আপনাকে। আপনি বলবেন, কেমন আছিস্, দেখতে এলুম। তার পরে কথাবার্তা হবে। দিদিমণিকে তখন কেউ বিরক্ত করবে না। বৌদিদি তার ব্যবস্থা করবেন।"

এই তো চমৎকার একটি ষড়যন্ত্র। তবে যে বলছিলুম ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই। মনে মনে হাসলুম। সরকার বলতে লাগল, "আপনার আশঙ্কার কারণ নেই। ওঁরা কলকাতার একটি বনেদী বংশ। সম্প্রতি ল্যান্সডাউন রোডে উঠে গেছেন। আগে থাক্‌তেন বাগবাজারে। এখনো সে অঞ্চলে তাঁদের শরিকরা আছেন। আপনি গেলে সুখী হবেন। কেউ আপনাকে অপমান করবে না। আপনার আশীর্বাদে আমাকে সকলে মানে। দারোয়ান তো আপনাকে অভ্যর্থনা করবে। আপনার জন্যে ফুলের মালা আনিয়ে রাখা হবে। আমরা কি জানিনে আপনি দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন?"

৭

এক একজনের দুর্বলতা এক এক জায়গায়। আমার দুর্বলতা কোন্‌খানে জানো? (দাদা প্রশ্ন করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন) কেউ যদি বলে আমি দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছি তা হলে যেমন দুর্বল বোধ করি তেমন আর কিছুতে না। তখন আমাকে দিয়ে যার যা খুশি করিয়ে নেয়। সরকারবাবুও আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিল যে আমি যাব।

কথা দিয়ে কথার খেলাপ করিনি কখনো। যেতেই হলো ল্যান্সডাউন রোড। সরকারের সঙ্গে কড়ার ছিল যে, আমি নিজের পরিচয়েই যাব, শরৎবাবুর পরিচয়ে নয়। কেউ যেন আমাকে আমার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত না করে। ওসব চক্রান্ত টক্রান্তর মধ্যে আমি নেই। তাই যদি পারতুম তা হলে দিদির প্রস্তাবে রাজী হতুম।

বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার কত না গরমিল। আশা করেছিলুম গেটে দারোয়ান থাকবে, মালা হাতে। সরকার থাকবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। গেট খোলা। ভিতরে যাবার রাস্তার দু'ধারে বাগান। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দু'দিকে দু'খানা বাড়ী। নম্বর আন্দাজ করে তার একখানার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চান?"

বাড়ীর মালিকের নাম জানা ছিল না। বিপদে পড়লুম। বললুম, "আমার নাম প্রিয়দর্শন ভদ্র।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, "চিনতে পারলুম না। আপনি কি ছেলেদের টিউটর হতে চান? কত দূর পড়াশুনা করেছেন?"

বলতে ইচ্ছা করছিল, মা ধরণী দ্বিধা হও। চলে যাব কিনা ভাবছিলুম।

ভদ্রলোক বুঝতে পেরে বললেন, "কাকে আপনার দরকার বলুন ? ডেকে দিচ্ছি।"

তাও কি জানি যে বলব ! সুমিতাকে দরকার বললে অনর্থ বাধবে। সরকারকে সরকার বললে মান থাকবে না। কী বলা যায় চিন্তা করছি এমন সময় দুটি ছোট ছোট মেয়ে এসে আমাকে মালা পরিয়ে দিল। নিয়ে গেল উপরে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ থ' হয়ে দেখলেন। তার পর গম্ভীর-ভাবে বললেন, "বুঝেছি। ঘটক !"

মালা পেয়ে মনটা সরস ছিল, নইলে ভদ্রলোকের উপর চটে যেতুম। উপরে আমাকে নিয়ে ওরা একটা ঘরে বসিয়ে দিল। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। কী করে থাকবে! বাগবাজারের বাড়ীর যাবতীয় সম্পদ ল্যান্সডাউনের বাড়ীতে ঠাসা হয়েছে! ওটা একাধারে বসবার ঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর। বোধ হয় খাবার ঘরও।

একটি বারো তেরো বছর বয়সের সুসজ্জিতা কিশোরী মেয়ে এলো খাবার দিতে। মনে হলো এরই জন্যে ঘটক আনাগোনা করছে। কে জানে হয়তো ঘটকালির জন্যেই আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। তখনকার দিনে যাদের দাদা বলা হতো আমিও তাদের একজন। আমার হাতে কয়েকটি সোনার চাঁদ ছেলে ছিল। আমি আদেশ করলে তারা কন্যা উদ্ধার করত, কেবল দেশ উদ্ধার নয়। সুমিতা কি তা হলে আমাকে এই জন্যে স্মরণ করেছে !

এতক্ষণ লক্ষ করিনি যে পিছনে একটা পর্দা ছিল। ওপাশে আর একখানা ঘর। সেই ঘরে আর একজন বসেছিল। চুড়ির টুংটাং কানে আসতেই আমি তার সম্বন্ধে সচেতন হই। ভাবছি সে কে এমন সময় সে নিজের থেকে বলল, "দাদা, একটু মিষ্টিমুখ করুন। ওসব বোনের হাতের তৈরি। বাইরের নয়।"

আমি অপ্রতিভ ভাবে বললুম, "সুমিতা নাকি ?"

"হাঁ, দাদা। আমিই।"

"বেশ, বেশ। শুনেছিলুম শরীর ভালো নয়। ভাবলুম একবার খবর নেওয়া যাক।"

"বড় কষ্ট পাচ্ছি, দাদা। আরো কিছু দিন কলকাতায় থাকতে পারলে হতো, কিন্তু তার তো উপায় নেই।"

"শুনে দুঃখিত হলুম, দিদি "

এই ভাবে শুরু হলো আলাপ। মাঝখানে একটা মোটা কালো পর্দা। দু'ধারে দুই ভাইবোন। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। এসব হলো বনেদী ঘরের নিয়ম। কথাবার্তার স্বর মাঝে মাঝে বদলাচ্ছিল। বোধ হয় অন্য লোকের যাতায়াতের দরুন। কেউ ও পথ দিয়ে গেলে স্মিতা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উঁচু গলায় বলে। নইলে নীচু গলায়।

ওর একটা ডায়েরি ছিল। অনেক দিনের লেখা। ঐ বইখানা ও আমাকে দিতে চেয়েছিল। প্রকাশ করার জন্যে নয়। পড়ে দেখার জন্যে। তার থেকে আমি জানতে পারব কী ওর দুঃখ। জানতে পারলে হয়তো বলতে পারব কী করলে ওর দুঃখ দূর হবে। এত লেখকের রচনা পড়ে। একমাত্র আমার উপরেই ওর বিশ্বাস।

বেচারিকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল যে, লেখার বেলা আমরা ওস্তাদ। কাজের বেলা আমাদের অন্য মূর্তি। চাঁদের উলটো পিঠ দেখলে আমার রচনাও তার বিস্বাদ লাগত।

বইখানা আমাকে দেবার জন্যে সে যখন পর্দাটা একটু ফাঁক করল তখন দেখতে পেলুম তার মুখ। দেহের অসুখ না মনের অসুখ কিসের অসুখ জানিনে। অসুখের বিষাদ ছিল তার মুখে। তা সত্ত্বেও সে মুখ রাজপুতানীর মুখ। ঝকঝকে তলোয়ারের সঙ্গেই তার তুলনা। গন্‌গনে আগুনের মতো তার চাউনি। দীর্ঘকাল অনিদ্রায় ভুগলে চোখের দৃষ্টি এ রকম জল্‌জলে হয়।

সে যে দেহে মনে জ্বলছে তা আমি সেই দিনই বুঝতে পেরেছিলুম আর একটু পরে। তার গল্প সে আভাসে ইঙ্গিতে ও যত কম কথায় পারে তত কম কথায় ব্যক্ত করল আমার কাছে। তার পরে বলল, "আমি আত্মহত্যা করব না।"

আমি শিউরে উঠলুম।

"নরহত্যাও করব না।"

আমি রোমাঞ্চ বোধ করলুম। সে যে ওসব কাজ পারে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

"এই দুটি সংকল্প গ্রহণ করতে আমার অনেক দিন অনেক রাত লেগেছে। এতদিন কলকাতায় থেকে আমি আর একটা সংকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আজকালের মধ্যেই সেটা নেওয়া হয়ে যাবে।"

আমার কৌতূহল জাগছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

সে নিজের থেকে বলল, "আমি আলাদা থাকব না। এক সঙ্গেই থাকতে হবে। অথচ—"

আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তাকে বলতে হলো না। কিন্তু আমাকে চিন্তা করতে হলো। এ মেয়ে যদি স্বামীর ঘর করতে যায় তা হলে কোন দিন বিষ খেয়ে মরবে, কিম্বা বিষ খাইয়ে মারবে। চিন্তা করতে করতে আমারি মুখ কালো হয়ে গেছল। তার তো বটেই।

আমি বলতে গিয়ে দেখলুম গলা শুকিয়ে গেছে। এক ঢোক জল খেয়ে বললুম, "কাজ কী তাড়াতাড়ি অমন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে? মানুষ যখন ইচ্ছা এক সঙ্গে থাকবে, যখন ইচ্ছা আলাদা থাকবে। ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি না থাকে তা হলে জীবন দুর্বহ হয়।"

"না, না। আপনি বুঝতে পারলেন না। আমি যে আলাদা থাকব না, এর মানে আমি আলাদা থাকতে দেব না। বিশ্রী লাগবে একসঙ্গে থাকতে। প্রতি দিন নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। সে যে কী জ্বালা

তা কি আমি জানিনে? পদে পদে আত্মসমর্পণের বিপদ। আর আত্মসমর্পণ মানেই তো আত্মহত্যা। তার পরে আমি কি আর বেঁচে থাকতে পারি! দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।"

সুমিতা কখন এক সময় পর্দার আবরণ সরিয়ে ফেলেছিল। তার দেহ দেখতে পাচ্ছিলুম। দীপশিখার মতো সে জ্বলছিল। সুন্দরী নয়, স্বাস্থ্যবতী নয়, কিন্তু সুমিতা, সুগঠিতা। হায়, এ নারী যদি কুসুমিতা হতো।

আমি বললুম, "অমন একটা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই বা করলে, মিতা।"

মিতা সম্বোধন শুনে সে প্রথমটা সচকিত হলো। তার পরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। "মিতা," সে ধরা গলায় বলল, "বড় নিঃসঙ্গ আমি। বড় নিঃসঙ্গ।"

কেউ কাঁদছে দেখলে আমারও কান্না পায়। চোখের কোণে জল এসে পড়ে। সমবেদনার সঙ্গে বললুম, "আমিও।" তার পরে যোগ করলুম, "দূর থেকে দু'জনে পরস্পরকে সঙ্গ দেব।"

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "বাঁচালে। আমি তা হলে কালকেই চলে যাই। এখানে একটুও ভালো লাগে না থাকতে।"

দুচার কথার পর সেদিন আমি বিদায় নিলুম। ডায়েরি আমার বগলে। মিতা বলল, "ও বই আমার প্রাণ দিয়ে লেখা। আমার প্রাণ আছে ঐ কৌটায়। আর কাউকে দিয়ো না। হারিয়ে যাবে।"

আমি তাকে আশ্বাস দিলুম। নামবার সময় মুখোমুখি হলো সরকার-বাবুর সঙ্গে। সে মাফ চেয়ে বলল, "পরের চাকর আমি। হঠাৎ কোথাও পাঠালে 'না' বলতে পারিনে। মালা দিয়ে গেছলুম খুকুমণিদের হাতে। পরিয়েছিল তো ঠিক?"

সেই ভদ্রলোক ইতিমধ্যে আমার পরিচয় পেয়েছিলেন। কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "আপনার মতো সজ্জনের পায়ের ধূলো পড়ল আমার

অকনে। কী সৌভাগ্য আমার। চিনতে পারিনি বলে কিছু মনে করবেন না, সার। ঘটককেও কতকটা আপনার মতো দেখতে।"

গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সময় সরকার বলল, "বাবুমশায়ের চোখ ও কান দুই খারাপ।"

সুমিতার কথা ভাবছিলুম। দারোয়ান যখন "প্যারে বাবু" বলে সেলাম করল তখন আমি অন্যমনস্ক। প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গেলুম।

সেই প্রথম দেখাই শেষ দেখা। কিন্তু চিঠিপত্র সম্প্রতি কয়েক বছর থেকে বন্ধ। নইলে পত্রালাপের বিরাম ছিল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে। কিম্বা বিশ্বাস করেছে যে, এ জন্মে এর কোনো সমাধান নেই। যদি না দেশ জুড়ে বিপ্লব হয়, যার যা বাঁধন আছে তা আপনি ছিঁড়ে যায়।

সেদিন বাসায় ফিরে তার ডায়েরিখানার পাতা ওলটালুম। সে লেখিকা নয়, মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। কিন্তু দেখছি তো লেখিকাদের দস্তুর। তাঁরা গুছিয়ে বলতে জানেন বটে, কিন্তু যে কথা বলেন সে তাঁদের মনের কথা নয়। মনের কথা লুকিয়ে রাখাই তাঁদের স্বভাব। সুমিতার বেলা কিন্তু তা নয়। সে যা বলে তা খোলাখোলি বলে। হাতে রেখে বলে না। সম্পাদক হিসাবে কত লেখিকার লেখা পড়তে হয়। সে সব পড়ে আমি লেখিকাকে পাইনে। কিন্তু সুমিতার বেলা লেখা তুচ্ছ, লেখিকাই আসল। সেই জন্যে সে আমার মিতা।

পরের দিন থেকে ডায়েরিখানা ভালো করে পড়তে আরম্ভ করি। আগাগোড়া পড়ে শেষ করতে আমার কয়েক দিন লাগে। সে তো ডায়েরি নয়। একটি মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়। ইংরেজ কবি অতি দুঃখে লিখেছিলেন, What man has made of man! সে মানুষ আর কেউ নয়, নিজের স্বামী, নিজের স্ত্রী।

এদের সম্বন্ধ শুরুতে বেশ মধুর ছিল। কী করে যে এরা নিকটতম

হয়েও দূরতম হয়ে উঠল সে অনেক কথা। অনেক দিনের ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ না ক্রমবিকার? মোট কথা, যা হয়েছে তা এক দিনে হয়নি। ক্রমে ক্রমে হয়েছে। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে হয়েছে। ভূমিকম্প হঠাৎ হয়, কিন্তু তার প্রস্তুতি অনেক দিন ধরে চলে।

এদের বেলা যে ভূমিকম্প ঘটে সেটাও অকস্মাৎ। এক দিন সুমিতা তার নারীসুলভ সহজ বোধ দিয়ে বুঝতে পারল তার স্বামী আর কোনো মেয়ের সঙ্গে সহবাস করেছে। সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, বলো, সত্য কি না?

প্রথমে উত্তর পেল না। তার পরে উত্তর পেল, না। তার পরে বহু পীড়াপীড়ির পর তা জানতে পেল তা ভূমিকম্পের চেয়ে কিসে কম! বরং আরো নিদারুণ।

সুমিতা আশা করেছিল তার স্বামী লজ্জিত হবে, অনুতাপ করবে, মার্জনা চাইব। প্রতিজ্ঞা করবে যে আর ওপথে যাবে না। কিন্তু তার স্বামী তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এমন ভাব দেখাল যেন সে স্বামীর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে মহা অপরাধ করেছে। ক্ষমাপ্রার্থনা যদি করতে হয় তবে করতে হবে তাকেই তার অনধিকার চর্চার জন্যে।

হতাশ হলো সুমিতা। হতভম্ব হলো। লজ্জার মাথা খেয়ে সখীদের বলতে পারে না কী হয়েছে, কেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। দিদিকে লিখতে পারে না। মা'কে জানাতে পারে না। বিয়ের দু'বছর পুরতে না পুরতে বিয়ের ফুল ভালো করে ফুটতে না ফুটতে এ কী ঘটল তার জীবনে! সে যে মা হয়নি এখনো। স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাবে কী করে! পারবে কেন! কত দিন পারবে!

তার স্বামী তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এত দিন তাই তো সে জানত। এটা কি বন্ধুর মতো কাজ হলো! বন্ধুর মতো কাজ হচ্ছে! স্বামী

কথাবার্তা বন্ধ করেছে এইজন্যে যে সে প্রতিদিন কৈফিয়ৎ চাইবে তাকে প্রতিবার একই রকম উত্তর দিতে হবে, কথায় কথা বাড়বে। তার চেয়ে চুপ করে নিজের কাজ করে যাওয়া ভালো। সুমিতা কী করে, কী করতে পারে দেখা যাক।

সাজানো সংসার ফেলে হঠাৎ বাপের বাড়ী চলে যাওয়া মুখের কথা নয়। একবার চলে গেলে তার পরে ফিরে আসাও পরাজয় স্বীকার ও প্রশ্রয় দান! তবে কি আত্মহত্যা করলে সকল দাহ জুড়াবে?

ডায়েরির পাতার পর পাতা আত্মহত্যার প্রসঙ্গে ভরা। আত্মহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে যত রকম যুক্তি থাকতে পারে প্রত্যেকটির উল্লেখ ও বিচার ছিল তাতে। কিন্তু একসঙ্গে নয়। এক এক দিন এক এক রকম চিন্তার উদয় হয়। কোনো দিন ভাবে, আত্মহত্যা যে করব তার ফলে কার কতটুকু আসবে যাবে? স্বামীর কি শিক্ষা হবে? বৈরাগ্য জন্মাবে? গোবিন্দলালের মতো সোনার ভ্রমর পূজা করবে? মরার পরে সোনার প্রতিমা হতে কেই বা চায়? কোনো দিন ভাবে, ফলাফল কী হবে না হবে কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু একজন দিনের পর দিন পাপ করে যাবে, আর একজন দিনের দিন তা সহ্য করে যাবে, এর একটা সীমা আছে। শেষ সীমায় পৌছলে আত্মহত্যাই একমাত্র পরিণাম।

একমাত্র? না, একমাত্র কেন? নরহত্যা বলে আর একটা পরিণাম আছে। অনুরূপ অবস্থায় কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ করে নরহত্যা। স্ত্রী যদি অসতী হয় ক'জন স্বামী আত্মহত্যা করে? অনেকেই তো করে নারীহত্যা। আদালতের বিচারে তারা খালাসও পায়। জনমতের বিচারেও। সতীনকে হত্যা করাও তো সনাতন প্রথা। নিজের হাতে করতে হবে না। অপরকে দিয়ে করাতে হবে। ধরা পড়ার চেয়ে ধরা

না পড়াই সম্ভবপর। ধরা পড়লেই বা এমন কী ক্ষতি! সাজা হবে, কিন্তু সেটা এমন কিছু অসহ্য নয়।

ডায়েরির পাতার পর পাতা জুড়ে নরহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে যত রকম তর্ক উঠতে পারে তার উল্লেখ ও আলোচনা। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। লিখতে লিখতে ওর যে হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! কয়েক মাসের ডায়েরি কেবল পাগলের প্রলাপ। ও যে পাগল হয়েছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ওর পাগলামি হিংসাত্মক হয়নি। নইলে নরহত্যা বা আত্মহত্যা একটা কিছু ঘটে যেত।

সব চেয়ে অদ্ভুত কথা, স্বামীর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। যার হৃদয় আছে তার হৃদয়ের পরিবর্তনও আছে। সে অনুতাপ করে, ক্ষমা চায়, দাম্পত্য সম্বন্ধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যত্নশীল হয়। কিন্তু এ লোকটা একেবারে পাষাণ। সুমিতা একদিন তাকে কাতর ভাবে সুধালো, ওগো বলো আমাকে, আমার কী কর্তব্য। আমি যে আর পারিনে।

সে তার কী উত্তর দিল, জানো? শুনলে বিশ্বাস করবে? কখনো কল্পনা করতে পারো?

বলল, তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে পারো। আমার সঙ্গে যদি রুচি না হয়।

কেমন, ভায়া, চমকে উঠলে তো? আমিও লাফ দিয়ে উঠেছিলুম। দুনিয়ায় এমন রাক্ষসও আছে। এ যে আভার স্বামীকেও হার মানায়। ডায়েরি ছেড়ে সেদিন আমি পিস্তলের খোঁজ করলুম। পুলিশের ভয়ে লুকোনো ছিল ওটা। পিস্তলটা হাতে নিয়ে ভাবলুম আমার সোনার চাঁদ ছেলেদের একজনকে দিয়ে বলি, যাও, গীতায় যা করতে বলেছে নিষ্কাম ভাবে করো। ফাঁসি হয় তো স্বর্গে যাবে।

পিস্তল খুঁজে পাওয়া গেল না। সুকুমার ওটাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখেছিল।

খানিকক্ষণ লম্ফঝম্প করে আবার ফিরে গেলুম ডায়েরির পাতায়। অবাক হয়ে পড়লুম সুমিতাও রিভলভারের জন্য বাড়ী তোলপাড় করেছিল। কাকে খুন করত লেখেনি। স্বামীকে, না সতীনকে, না নিজেকে। রিভলভার খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটা পেনসিল কাটা ছুরি তুলে নিয়েছিল, কিন্তু তা দিয়ে কাউকে আঘাত করার আগে তার স্বামী তাকে কোলে টেনে নেয় ও আদর করে। সে অবশ্য দস্তুরমতো বাধা দেয়। কিন্তু শুধু দস্তুরমতো।

বাস্তবিক, মেয়েদের দুর্বলতা দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে, ভায়া। ছি ছি ছি। যে মেয়ে এক মিনিট আগে রিভলভার হাতে পেলে অনর্থ বাধাত সেই মেয়ে এক মিনিট পরে একটুখানি ধস্তাধস্তি করে তার পরে—যাক, আমি তো বিয়ে করিনি, আমি তার কী জানি! তুমি জানো।

দাদা বদন বিকৃত করে নীরব হলেন। আমিও লজ্জায় ক্ষোভে অধোবদন।

এই তোমার স্ত্রীজাতি! (দাদা আবার আরম্ভ করলেন।) এরই বন্দনা করে আমি কবিতা লিখেছি এবং সেই বন্দনায় বিশ্বাস করে জীবন-ভর কেঁদেছি। যাক্, শোনো যা বলছিলুম।

সুমিতা যে উল্লসিত হয়েছিল তার ডায়েরি থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু কুসুমে কীট থাকার মতো আনন্দে সন্দেহ ছিল। তার স্বামী কি তা হলে অনুতপ্ত! আর কখনো ও পথে যাবে না! কী জানি! প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। যদি উত্তর না পায়, যদি সেই পুরাতন উত্তর পায়!

কাজ নেই প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করতে গিয়েই তো এত কাণ্ড। চোখ

বুজে থাকলে তো বেশ সুখে থাকা যেত। কত মেয়ে চোখ বুজে আছে বলেই সুখে আছে। আগে মা হও, আগে জীবনের বড় বড় সাধগুলো মিটুক, তার পরে প্রশ্ন করা যাবে।

এই ভাবে সুমিতা মনকে চোখ ঠারল। ডায়েরির পাতা হিসাব করলে দেখা যায় এই ভাবে কাটল দেড় বছর। কত বার তার বুক ঠেলে উঠল সেই প্রশ্ন, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না, মুখের আগায় দুলল। সে জানত সে প্রশ্নের কী উত্তর, নতুন করে জানবার ছিল না কিছু। জানবার যা ছিল তা বিনা বাক্যেও জানতে পারা যেত। অভিচার থেকে বিরতি।

সে মনে করেছিল একদিন সে মা হবে। মা যদি হয় তা হলে তার সব দুঃখ সার্থক হবে। তারপরে আর স্বামীসঙ্গের প্রয়োজন থাকবে না। সে সীতার মতো তপস্বিনী হবে। কত শত পতিপরিত্যক্তা আছে, তাদের যদি সহ্য হয় তারও হবে।

কিন্তু কই, তেমন তো কিছু ঘটল না। তা হলে কি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে! অপেক্ষার ধারা কি এই! এমন করে কি মনুষ্যত্ব বাঁচে! যার মনুষ্যত্ব নেই তার নারীত্ব থাকে কী করে! সে তো বিশুদ্ধ স্ত্রীপশু।

অবশেষে সে তার স্বামীকে বলল, "তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই? নিজের সুখ নিয়ে আছ, আর এক জন যে ভরা ভোগের মাঝখানে অসুখী। এটা কি ভোগ, না দুর্ভোগ?"

স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "তোমাকে সুখী করার জন্যেই আমার চেষ্টা। তুমি যদি সুখ না পাও তবে আর কেন?"

তাদের সম্পর্কে সুতো আবার ছিঁড়ে গেল। তখন সে সাহস করে সেই প্রশ্নটা আবার তুলল। উত্তরে শুনল, "হিন্দীতে একটি দোঁহা আছে। কবিরের না তুলসীদাসের, ঠিক মনে নেই কার।

চম্পায় হৈ তিন গুণ রঙ্, রূপ অওর বাস
এক অবগুণ হৈ জো ভ্রমর ন জাওয়ে পাস।

তোমারও তিনটি গুণ আছে। কিন্তু একটি অবগুণ আছে যার জন্যে ভ্রমর তোমার পাশে আসে না।"

সুমিতা জানতে চাইল, "আমার অবগুণ কী দেখলে তুমি?"

উত্তর পেলো, "তুমি বড় বেশি ঝাঁজালো।"

সুমিতা অবাক হয়ে বলল, "ওটা এমন কী দোষের!"

শুনল, "দোষের কি না জানিনে। হয়তো দোষের নয়। আর কারো কাছে গুণের হয়তো। সুমিতা, তোমার উচিত ছিল আর কাউকে বিয়ে করা।"

সুমিতা রাগ করে বলল, "তোমারও উচিত ছিল আমাকে বিয়ে না করা। এখন ওকথা বললে চলবে কেন!"

সে দিন ওদের বোঝাপড়া শেষ হলো না। জের চলল দিনের পর দিন। দু'পক্ষে অনেক বক্তব্য জমেছিল। কেবল বক্তব্য, জ্ঞাতব্য। স্বামী কোথায় যায়, কার কাছে যায়, কী তার গুণ, সে কি এক, না একাধিক। এমনি কত কথা।

শেষে সুমিতা বলল, "তোমার বিশ্বাস তুমি যা খুশি করতে পারো, কেন না তুমি পুরুষ। তোমার এই বিশ্বাস ঠিক নয়।"

তার স্বামী বলল, "তুমিও যা খুশি করতে পারো, আমার আপত্তি নেই।"

সুমিতা জ্বলে উঠল, "কী করতে পারি?"

শয়তানটা বলল, "যাতে তোমার সুখ!"

তারপর তাদের মধ্যে হাতাহাতি বেধে গেল। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! সুমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "লম্পট!...... নিজে যেমন, মনে করেন সকলে তেমনি।"

৮

তার স্বামী আবার মৌনব্রত অবলম্বন করল।

তার পরে ?

তার পরে নিজের করাল রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেল সুস্মিতা। কে জানে কোন্ দিন খুন করে বসবে স্বামীকে অথবা নিজেকে! তার চেয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভালো, যেখানে স্বামী নেই, স্বামীর উপর রাগ করে খুনোখুনির ভয় নেই। চলে যাবার কথা আগেও ভেবেছে, কিন্তু যদি ফিরে আসতে হয় কোন্ মুখে ফিরে আসবে! হয়তো এসে দেখবে তার বিছানায় আর এক জন শুয়েছে। তখন কি সে আঁসবটি তুলে নিয়ে মুড়ো কুটবে না ?

এবার কিন্তু চলে যাওয়াই স্থির করল সে। চলে যাবে, ফিরে আসবে না। যদি না স্বামীর স্বভাব বদলায়। অথবা তার নিজের। স্বামীর প্রথম রিপু, নিজের দ্বিতীয় রিপু। চলে যাবে তার দিদির কাছে কলকাতায়। দিদির সাহায্যে অন্য কোনো পরিবারে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নেবে। ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াবে, সূচীশিল্প শেখাবে, খুব যে ভালো লাগবে তা নয়। কিন্তু খুনজখম করে জেল খাটার চেয়ে ভালো।

চলে গেল সুস্মিতা। বাধা পেলো না।

কিন্তু দিদির বাড়ী পৌঁছেই বাধল অসুখ। বুকে ব্যথা। এ ব্যথা তার কোনো দিন ছিল না। এ কি দেহের না মনের না হৃদয়ের ? চিকিৎসা চলল। ডাক্তার এলো, নার্স এলো। খরচ হলো দিদির। তার মানে জামাইবাবুর। কী করে এ ঋণ শোধ করবে সে! কবে শোধ করবে ? এ অসুখ নিয়ে কাজ করবে কার বাড়ীতে ? পারবে কেন ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে যাবার কথাই ফিরে ফিরে মনে এলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে কি এক মুহূর্ত শান্তি পাবে? অশান্ত হৃদয় নিয়ে এক দিন কি আত্মহত্যা করবে না? অন্যথা নরহত্যা? কে জানে কোন্ নিষ্ঠুর নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকার মতো দুর্ঘটনাস্থলে!

এমন সময় তার হাতে পড়ল আমার রচনা। মনে হলো তার সঙ্গে কোথায় যেন অদৃশ্য মিল আছে আমার। ইচ্ছা করল আমাকে তার সব কথা জানাতে। তার পরে আমার পরামর্শ জানতে। আশা করেছিল খুব সহজেই আমার দেখা পাবে। কল্পনা করেনি যে আমার দেখা পেতে এত দিন লাগবে। ইতিমধ্যে দু'দুটো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আর একটা সিদ্ধান্ত বাকি। সেটাও নিতে যাচ্ছে তবু আমার পরামর্শ চায়। সামনে মহাসঙ্কট। কী যে আছে কপালে। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কে যে কখন উড়ে এসে জুড়ে বসে কে জানে!

ফিরে গিয়ে সুমিতা আমাকে চিঠি লিখল। জানতে চাইল ডায়েরি পড়ে আমার কী বক্তব্য। নিজের সম্বন্ধে জানাল, সাধুরা কণ্টকশয্যায় শুয়ে তপস্যা করেন। সে কণ্টক সহ্য হয়। কিন্তু এ কণ্টক সহনাতীত। মনে মনে সন্ন্যাস নিয়েছি। তবু এক সঙ্গে একশো কাঁটা বিঁধছে। আবার পালাব কি না ভাবছি। পালাতে পারলে বাঁচি! কিন্তু কোথায়। তুমি কি হতভাগিনীকে আশ্রয় দেবে। তোমাদের সঙ্গে আমিও তো দেশের কাজে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারি। বলো তো বোমা ছুঁড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে রাজী আছি।

সুমিতাকে আশ্রয় দিতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে ভাবে তার সমস্যার সমাধান হবে না। কয়েকদিন পরে সে আবার ফিরে যেতে চাইবে। না গেলে তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আর কেউ তার শয্যা অধিকার

করবে। তার মন পড়ে আছে তার শয্যায়। হলোই বা কণ্টকশয্যা। বার বার চলে আসবে, বার বার ফিরে যাবে, এ খেলা সে খেলতে চায় তো একা খেলুক, আমাকে বা আমার সহকর্মীদেরকে তার খেলার সাথী করে তার কী লাভ! অমন করে কি দেশের কাজ হয়! বোমা ছুঁড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে রাজী আছে এমন মেয়ে কি এই একটি! অনেক মেয়ের কাছে আমরা এ প্রস্তাব শুনেছি। কিন্তু মেয়েদের আমরা বিপদের মুখে ফেলতে চাইনে। তাতে আমাদের পৌরুষ লজ্জা পায়। মরতে হয় আমরা মরব, মারতে হয় আমরা মারব! পুরুষের সঙ্গে পুরুষের সংগ্রাম। নারী কেন পুরুষের স্থান নেবে?

সত্যি, আমার কথাটা ভেবে দেখো। হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। মহাত্মাজী তাঁর আন্দোলনে মেয়েদের ডাক দিয়েছেন, কারণ ওটা গণ-আন্দোলন, গণ বলতে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বোঝায়। কিন্তু আমাদের ওটা আন্দোলন নয় দ্বৈরথ। সবাইকে আমরা ডাকিনি, ডেকেছি বাছা বাছা জনকতক ছেলেকে। যাদের সঙ্গে ডুয়েল তারা পুরুষ। সুতরাং যারা ডুয়েল লড়বে তারাও পুরুষ। অপর পক্ষে যদি নারী থাকত এ পক্ষেও থাকত। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওরা নারীর সাহায্য নেয়নি। আমরা কেন নেব? নিলে কাপুরুষতার পরিচয় দেওয়া হবে। আমি যত দিন সম্পাদক ছিলুম তত দিন এ বিষয়ে আমার রায় চূড়ান্ত ছিল। মেয়েদের আমরা আসতে দিয়েছি, কিন্তু ফ্রণ্ট লাইনে নয়। ওদের যেমন টেলিফোন অপারেটর, আমাদের তেমনি চিঠিপত্র অপারেটর।

না, নারীকে পুরুষের স্থান দেওয়া হবে না। নারী যদি কোনো কারণে তার নিজের স্থান হারায় তবে তাকে স্বস্থানের জন্যে জীবনপণ করতে হবে। সুমিতাকে লিখলুম, আমাদের আনন্দমঠে শান্তি বা কল্যাণীর স্থান নেই। আশ্রয় এখানে হবে না। তোমার সংগ্রাম সব দেশের

সব যুগের সব নারীর সংগ্রাম। সে সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়ে কেন তুমি আসতে চাও বাংলাদেশের বর্তমান কালের মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয় যুবকের সংগ্রামে? তোমার সংগ্রামে তুমি আমাদের সহানুভূতি পাবে। আমাদের সংগ্রামে আমরাও পাব তোমার সহানুভূতি। কিন্তু কেউ কারো স্থান নেবে না। তুমি আমার মিতা, আমি তোমার মিতা। কিন্তু আমার স্থান তোমার নয়, তোমার স্থান আমার নয়। তোমাকে তোমার স্থানেই থাকতে হবে। তার মানে এ নয় যে স্বামীর বাড়ীতেই থাকতে হবে। ইচ্ছা করলে দিদির বাড়ী যেতে পারো, কিন্তু উদ্দেশ্য হবে স্বস্থানের জন্যে সংগ্রাম। খোরপোশের মামলা চালাতে পারো, চালাতে পারো আইনত স্বতন্ত্র থাকার মামলা। এসব যদি পছন্দ না করো তা হলে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করো। প্রতিজ্ঞা করো যে স্বামীর অন্ন গ্রহণ করবে না। সন্ন্যাসের প্রতিজ্ঞা তো ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছ।

সুমিতা এর উত্তরে কী লিখল, জানো? লিখল, ওটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, ওটা আমার প্রতিক্রিয়া। তবে আত্মসমর্পণ করব না, এটা স্থির। তারপর স্বাবলম্বন সম্বন্ধে যা বলছ, তার জবাব এই যে স্বামীর বাড়ীতে থেকে স্বাবলম্বী হওয়া যায় না। স্বাবলম্বী হতে হলে অন্যত্র যেতে হয়। কিন্তু আমি যদি অন্যত্র যাই আমার জায়গা বেদখল হবে। অন্তত সেই কথা ভেবে মন খারাপ হবে। বুকের ব্যথায় কষ্ট পাব। তবে যদি দেশ আমাকে ডাক দেয় তার একটা উন্মাদনা আছে। উন্মাদ হয়ে ঝাঁপ দিতে পারি; বাঁচি আর মরি। সেইজন্যেই তো এত করে বলছি, আমাকে তোমরা ডাক দাও। আমি দেশের কাজে ঝাঁপ দিই। ফাঁসিকাঠে ঝুলে আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াক। আর যদি বেঁচে থাকি তো সেটা হবে বাঁচার মতো বাঁচা। তার স্বাদ পেলে কেউ কুলে ফিরে আসার কথা ভাবে না।

সত্যি তাই। আমি যদি সুমিতা হতুম আমিও তাই লিখতুম।

তা বলে আমি তাকে ডাক দেবার কে! আমি কি দেশ! ফিরে যাবার পথ খোলা না থাকলে সে যে কোথায় তলিয়ে যাবে কে জানে! ফাঁসিকাঠে ঝোলা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তার কপালে হয়তো আছে কারাবাস। কারাগার থেকে বেরিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে? কে তাকে আশ্রয় দেবে? স্বাবলম্বনের জন্যে কী করতে পারে সে? মরবে তো হাসপাতালে যক্ষ্মায়। নয়তো আবার সেই স্বামীর ঘরে সতীনের ঝাঁটায়।

আমি বিশ্বাস করতুম সব সমস্যার সমাধান আছে। খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু স্মিতার সমস্যার সমাধান কী? খুঁজে তো পাইনে। আমার বিশ্বাসের মূলে ঘা লাগল। তবে কি এর কোনো সমাধান নেই? না, আছে সমাধান। দেশ যদি ডাক দেয় তাহলে সে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচবে। সেই যে জীবন তার মধ্যে মরণও আছে, আছে ব্যাধি, আছে জরা; তবু তা অমৃত। একবার যে তার স্বাদ পেয়েছে সে চিরকালের মতো সুখী হয়েছে, তৃপ্ত হয়েছে। কিন্তু আমি তো দেশ নই। আমি ডাক দেবার কে! গদ্য লিখতে লিখতে আমি হয়ে উঠেছি নীরস নীরেট গদাই লস্কর। তাই গদাই লস্করী ভাষায় লিখি, স্বাবলম্বিনী হতে চেষ্টা করো।

মোট কথা, সে চায় আত্মবিসর্জন। তার জন্যে আগেকার দিনের ব্যবস্থা ছিল ধর্মের ডাক শুনে সর্বস্বত্যাগ। মীরাবাঈ তার ক্লাসিক উদাহরণ। আজকের দিনে সে ব্যবস্থা নিষ্প্রভ। এখন চাই নতুন কোনো ব্যবস্থা। কে তার কথা ভাবছে! আমি একা কত ভাবব!

বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদা অন্যমনস্ক হলেন।

স্মিতার কাহিনী শুনতে শুনতে আমিও অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। আমার মতে এ সমস্যার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমাধান বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মেয়েরা এ নিয়ে এত

জলে পুড়ে মরে না। তারা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়। স্বামীর ভাত খায় না। তার পরে আর কাউকে সাঙা করে। সমাজ তা নিয়ে হৈ চৈ করে না। তাদের অসতী বলে না। যত কিছু ফ্যাসাদ আমাদের তথাকথিত উচ্চস্তরকে নিয়ে। আমাদের নীতিবোধ কেবল মেয়েদের বেলা সক্রিয়। তাই যত রকম উদ্ভট সমাধান উদ্ভাবন করতে হয়।

বললুম, "দাদা, আপনার কতকগুলো প্রচ্ছন্ন সংস্কার আছে। সেই জন্য আপনি সরলকে জটিল করে নতুন নতুন ধাঁধা তৈরি করছেন। সুমিতার স্বামী আপনার চেয়ে সোজা মানুষ। সে তার স্ত্রীকে সোজা বলে দিয়েছে তুমি আর কারো সঙ্গে সুখী হতে পারো।"

দাদা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "নিজে জাহান্নামে গেছে, তাই যথেষ্ট নয়, আর একজনকে জাহান্নামে পাঠাবে? না, না, না, না, না। তা কিছুতেই হবে না।"

"তা হলে আপনি অষ্টম এডওয়ার্ডকে নিয়ে কবিত্ব করতে যান কোন্ মুখে?"

"ও কথা," দাদা মাথা চুলকে বললেন, "অসাধারণদের বেলা খাটে। আমরা সাধারণ লোক। আমাদের বেলা অন্য নিয়ম।"

আমি হেসে বললুম, "দাদা, প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখুন। সমগ্র প্রাণীজগতে ব্রহ্মচর্যের মতো অসাধারণ আর কী আছে? অথচ এই হলো আপনার ব্যবস্থা আভার মতো সুমিতার মতো সাধারণ মেয়ের জন্যে।"

দাদার চোখে জল দেখা দিল। তিনি ভারী গলায় বললেন, "ভাই, আমি কি তা বুঝিনে? কিন্তু নারী যে তা হলে ছোট হয়ে যায় আমার চোখে। যে ছোট আমি কি তার বন্দনা গাইতে পারি! তুমি পারো?"

"আমার চোখে ছোট হয় না। তাই আমি পারি।" আমি বললুম।

দাদার কাহিনীর খেই হারিয়ে গেছল। খেই খুঁজে পেয়ে হাতে নিলেন।—

যা বলছিলুম। সুমিতা জেদ ধরল কলকাতায় আ'বে, আমার সঙ্গে থাকবে, দেশের কাজে ঝাঁপ দেবে। কণ্টকশয্যা আর তার সহ্য হচ্ছে না। সারাক্ষণ হুল ফুটছে। আমি যদি 'না' বলি তা হলে সে রেল লাইনে মাথা পেতে দেবে। ভাবনায় পড়লুম।

আমার সহকর্মী সুকুমার ধরা পড়েছিল বলেছি বোধ হয়। তাকে ওরা মাণ্ডালে পাঠায়। আমার বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ ছিল না। আমাকে ধরল না, কিন্তু আমার কাগজের কাছে জামানত চাইল। জামানতের টাকা দিতে পারি এমন অবস্থা আমাদের নয়। কাগজ উঠে গেল। সম্পাদক তা হলে কিসের সম্পাদনা করবে! আমার প্রয়োজন ফুরোল। বন্ধুরা বলল, তুমি এবার চাকরির চেষ্টা দেখ। চাকরির জন্যে আমাকে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হলো। কিন্তু সেই যে কিছু দিন উত্তর বঙ্গে জমিদারি চালিয়েছিলুম। সেই থেকে আমার কিছু সুনাম হয়েছিল। উত্তর বঙ্গের আর এক জায়গায় কাজ জুটে গেল। জমিদারির কাজ।

কাজ নিয়ে যখন আমি কলকাতা ছাড়ি তখন সুমিতাকে লিখি, লোকনিন্দার ভয় আমার নেই। তোমার যদি না থাকে তুমি আমার সঙ্গে আমার মাসিমার সঙ্গে যত দিন খুশি থাকতে পারো। ছোটখাট একটা মেয়েদের স্কুল চালাবে। সেও দেশের কাজ। তবে তাতে খুনজখম ফাঁসি ইত্যাদি নেই। কেমন, রাজী?

সুমিতা এর কোনো উত্তর দিল না। বোঝা গেল রাজী নয়। পরে তার সঙ্গে আমার আরো অনেক দিন চিঠি লেখালেখি চলেছিল। কিন্তু

আমার কাছে আসতে চায়নি। আমিও বলিনি। ধীরে ধীরে পত্রবিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। শেষ চিঠি কে লিখেছিল মনে নেই। হয়তো সুমিতা। সে সব চিঠি মনে রাখবার মতো নয়।

তুমি তো পাটনা যাচ্ছ। তার খবর নিতে পারো। দেখা করলেই বা ক্ষতি কী! হুঁ! তার স্বামী কী মনে করবে! ঠিক। তবু জানতে ইচ্ছা করে ও কেমন আছে। কী ভাবে ওর সমস্যার সমাধান হয়েছে। আশা করি আভার মতো নয়।

এর দিন কয়েক পরে আমি পাটনা যাই। পাটনায় সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, কিন্তু তার খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম তার স্বামীর সঙ্গে সে রোজ ক্লাবে যায়, টেনিস খেলে। বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে তারা সুখী দম্পতি নয়। বা তাদের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নয়। তবে তাদের ছেলেমেয়ে হয়নি। এর থেকে দাদার অনুমান, সুমিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি। আমার অনুমান, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়নি। মুরগী খায় না, কেননা পায় না। দাদাকে এ কথা বলায় তিনি আমার উপর অগ্নিশর্মা।

"মেয়েদের প্রতি তোমার একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা নেই। তুমি নাইট নও।" তিনি জ্বলে উঠলেন।

আমি অনুযোগ করলুম। বললুম, "আমি তো বহুবচন ব্যবহার করিনি। সুমিতার কথা হচ্ছিল। আর কারো কথা নয়।"

"তোমার মনোভাব দেখে মনে হয় তুমি তপস্বিনীদের প্রতি সশ্রদ্ধ নও। সেইজন্যে আমার ভরসা হয় না তোমার কাছে আর কারো কথা বলতে।" দাদা একটু নরম হলেন।

"আর কারো কথা বলতে ইচ্ছা করেন নাকি?" আমি কৌতূহলী হলুম।

দাদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হায়! আমার হাতে যদি অধীন

কলম থাকত আমি নিজেই লিখতুম সে সব কাহিনী। তোমার কাছে জরীন কলম আছে, কিন্তু তোমার মনে ভক্তিশ্রদ্ধা নেই, তুমি পরিহাস করতে পটু। উঃ কী ভয়ানক কথা! মুরগি খায় না, কেননা পায় না। তোমার কি দয়ামায়া নেই। কত দুঃখ ঐ মেয়েটির। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়।"

"কই, সে কথা তো কেউ বলল না, ববং শুনলুম বেশ মোটা হয়েছে।"

"মোটা হয়েছে। থাক, থাক! আর ও প্রসঙ্গ নয়। আমি ওকে দয়া করি।"

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, "দাদা, মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই দয়া করিনে। যাকে দয়া কবি তাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমি যদি সুমিতা হতুম তা হলে অমন স্বামীব সঙ্গে ঘব করতুম না, পালিয়ে গিয়ে আর কাউকে নিয়ে ঘর করতুম। তখন আমার এক রাশ ছেলেমেয়ে হতো।" যোগ করলুম, "তারা সত্যকুলজাত।"

প্রিয়দর্শনদা কানে আঙুল দিয়ে বললেন, "না, না, অমন কবলে নারী আমার চোখে ছোট হয়ে যাবে। কী করে তাকে বন্দনা করব!"

"ছোট হয়ে যাবে কী। ছোট হয়ে গেছে।" আমি নির্মমভাবে বললুম, "স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এমন নয় যে একজন বাইরে ভোজ খেয়ে বেড়াবে, আব এক জন ঘরে খিল দিয়ে উপবাস করবে। কেউ যদি তা করে তা হলে সে শ্রদ্ধার পাত্রী নয়, করুণার পাত্রী। দাদা, আপনি তাকে দয়া করেন, দয়া করেন বলেই বন্দনা করতে পারেন না।"

"কী জানি!" দাদা উদভ্রান্ত হয়ে বললেন, "যে মেয়ে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করল না, দিনের পর দিন প্রলোভন দমন করল, জয় করল প্রথম রিপুকে, দ্বিতীয় রিপুকেও, তাকে যদি শ্রদ্ধা না করি তো শ্রদ্ধা করব কাকে! হাঁ, দয়া করি, কিন্তু শ্রদ্ধাও করি।"

বাস্তবিক, এ কিছু সামান্য কাজ নয়, এই দিনের পর দিন আত্মরক্ষা ও আত্মসংবরণ। আমি নত হয়ে বললুম, "তা ঠিক। সুমিতা অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু নিরর্থক এ তপস্যা উর্ধ্ববাহুর মতো। এর চেয়ে কত না ভালো হতো যদি সে আর কারো সঙ্গে সুখী হতো। তখন তাকে আমি বন্দনা করতুম। বলতুম, এই তো পরিপূর্ণ নারী।"

দাদা মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, না, না।"

নারীত্বের আদর্শ নিয়ে প্রিয়দর্শনদার সঙ্গে আমার মতভেদ উভয়কে পীড়া দিল। নারী তেজস্বিনী হবে, অসম্মান সহ্য করবে না, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, এই পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু নারী তপস্বিনী হবে, অন্য পতি গ্রহণ করবে না, বন্ধ্যা হবে, তাঁর সঙ্গে এত দূর যেতে আমি নারাজ। অবশ্য যে ক্ষেত্রে প্রেম আছে সে ক্ষেত্রে প্রেমের আদর্শ নারীত্বের আদর্শকে অতিক্রম করবেই। পৌরুষের আদর্শকেও। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তা নেই সে ক্ষেত্রে পুরুষকে তো কেউ তপস্বী হতে বলে না, অন্য বিবাহ করতে নিষেধ করে না, অপুত্রক হতে প্রশ্রয় দেয় না। তা হলে নারীর বেলা কেন ভিন্ন বিধান?

এর পরে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কমে এলো। কিন্তু মনে হলো দাদার মন ভারাক্রান্ত। সেখানে মেঘের পর মেঘ জমেছে। বর্ষণের জন্যে উন্মুখ হয়েছে। অথচ আমার দিক থেকে আগ্রহ না দেখলে তিনি মনের ভার লাঘব করবেন না। সেই জন্যে এক দিন আমিই তাঁর ওখানে হাজির হলুম।

বললুম, "উত্তর বঙ্গে আবার কাজ নিয়ে নতুন কোনো বিপদে পড়তে হয়নি আশা করি।"

"বিপদ!" তিনি চোখ বুজে বললেন, "বিপদ আমার জীবনের পদে পদে। কিন্তু কোন ধরনের বিপদের কথা শুনতে চাও? যে রকম শুনেছ?"

আমি বললুম, "আচ্ছা।"

তিনি যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। দেখতে দেখতে শুরু করে দিলেন।—

উত্তর বঙ্গের এবার যেখানে যাই সেখানে আমার জন্যে বাগানবাড়ী বরাদ্দ ছিল না। মালিক ছিলেন সাহা মহাজন থেকে হঠাৎ জমিদার। আগে তাঁর নাম ছিল নিধুবনচন্দ্র সাহা। তার পর হয় নিধুবনচন্দ্র সাহা রায়। শেষ হলো নিধুবনচন্দ্র রায়। আমি যে সময় যাই সে সময় তিনি রায় বাহাদুর হবার সাধনা করছেন। রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম চলছে। তিন তিনটে গেস্ট হাউস খুলেছেন। একটা সাহেবদের জন্যে, একটা হিন্দুদের জন্যে, একটা মুসলমানদের জন্যে। কোনো রাজপুরুষের নামে ইস্কুল করে দিয়েছেন, কারো নামে ডাক্তারখানা। কালেক্টার সাহেবের মেমসাহেবের পদার্পণ চিরস্মরণীয় করতে একটা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। সেটা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা। কেন, বলছি।

আমার উপর ভার পড়ল শিক্ষয়িত্রী সন্ধান করবার। আমি চিঠি লিখলুম স্নমিতাকে। স্নমিতা জবাব দিল না। অগত্যা আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে হলো কলকাতার সংবাদপত্রে। বিজ্ঞাপনের উত্তরে এলো খান কয়েক আবেদন। কিন্তু আবেদনকারিণী বলতে একজন কি দুজন। আর সকলে আবেদনকারী। অদ্ভুত ব্যাপার। স্পষ্ট লেখা ছিল শিক্ষয়িত্রী চাই। অথচ আবেদন করছেন পুরুষ। একজন লিখলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী দু'জনে মিলে পড়াবেন। যদিও তাঁর স্ত্রী কোনো দিন ইস্কুলে পড়েননি। কমিটির সভ্যেরা বললেন শিক্ষিতা মহিলারা যখন চাকরি করতে রাজী নন বোঝা যাচ্ছে তখন শিক্ষিত বেকার পুরুষদের একটা স্নযোগ দেওয়া কর্তব্য, কেবল এইটুকু দেখলেই চলবে যে তাঁরা বিবাহিত। আমি বললুম তা হতে পারে না। মেয়েদের ইস্কুল মেয়েরাই চালাবেন।

শিক্ষিতা মহিলারা যদি রাজী না হন তা হলে ইস্কুল ক্রিশ্চান মিশনারীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাঁরা যেমন করে হোক শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করবেন।

ভাবী রায় বাহাদুর আমার পরামর্শ অনুমোদন করলেন। কমিটির সভ্যেরা আমার উপর রুষ্ট হলেন। কিন্তু প্রাণ ধরে ক্রিশ্চান মিশনারীদের হাতে বিদ্যালয়টাকে সঁপে দেওয়া যায় না। সেইজন্যে আমার উপর ছেড়ে দিলেন যেমন করে হোক শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহের দায়িত্ব। আমি ব্রাহ্ম বন্ধুদের চিঠি লিখলুম। ক্রিশ্চান আলাপীদেরও চিঠি লিখতে ভুললুম না। হিন্দু বিধবাদের আশ্রম খুঁজেপেতে সেখানেও তদ্বির করলুম। ফল কিছু কিছু পাওয়া গেল। হেড মিস্‌ট্রেস হলেন এক ক্রিশ্চান মহিলা। কালেক্টার সাহেবের মেমসাহেব যাতে খুশি হয়ে সাহেবকে বলেন রায় বাবুকে রায় বাহাদুর করা কি খুব বেশি অন্যায় হবে?

শিক্ষয়িত্রীদের স্থান একে একে পূরণ করা হলো, শূন্য থাকল কেবল একটিমাত্র স্থান। তার জন্যে প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলে রেখেছিলেন যে, সামনের বছর ভার্নাকুলার ট্রেনিং পাশ করলে তাঁর কন্যাকে যেন সেই পদে নিয়োগ করা হয়। আমিও মৌন থেকে সম্মতির লক্ষণ দেখিয়েছিলুম। এই তো অবস্থা। এমন সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়ীতে এলো একটি মেয়ে। বয়স কম নয়। তিন ছেলেমেয়ের মা। হাঁ, হিন্দু।

মেয়েটি আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "দাদা, বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণ নিতে এসেছি। শরণাগতাকে ফিরিয়ে দেবেন না।"

চাকরি চায়। কিন্তু পড়াশুনা উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত। তবে বাড়ীতে ম্যাট্রিকের বই পড়েছে। প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবার ইচ্ছা আছে। আমার লেখার একজন ভক্ত। আমার পত্রিকাও নিয়মিত পড়ত। দূর থেকে আমাকে দাদা বলে পূজা করে এসেছে। কিন্তু এমন বিপদে পড়তে

হবে ও বিপদে মধুসূদনের মতো বিপদে প্রিয়দর্শনের নাম নিতে হবে তা কি তখন জানত!

নীলনয়না তার নাম। কেউ ডাকে নীলা, কেউ ডাকে নয়না। একটু আধটু লেখার শখও আছে। পাঠিয়েছিল আমার কাগজে কয়েকটি কবিতা। ছাপা হয়নি, ফেরত গেছে। আমি নাকি লেখার নীচে লিখেছি শুধু আন্তরিকতা থাকলে কী হবে? ধ্বনি থাকা চাই। আমার মন্তব্য তার কাছে আছে। বাঁধিয়ে রেখেছে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছে। আপাতত কবিতার কথা ভাবছে না। সে জন্যে আসেনি। এসেছে চাকরির জন্যে। চাকরি না পেলে বাড়ী ফিরে যাবে না, বাড়ী আর তার বাড়ী নয়। যাবে নদীর জলে ডুব দিতে।

৯

চাকরি করতে যারা চায় তাদের অবস্থা দেখে বোঝা যায় কেন চায়। কিন্তু নীলনয়নার দিকে তাকালে একথা মনে হয় না যে তার অবস্থা ভালো নয়। এক গা গয়না, জমকালো শাড়ী, সিঁদুর জলজল করছে কপালে ও সিঁথিতে। কী এমন হয়েছে যে চাকরি করতে হবে এই লক্ষ্মীপ্রতিমাকে!

বললুম, "বোন, চাকরি যদি তোমাকে দেওয়া হয় তা হলে গরীবের মেয়েরা যাবে কোথায়! বিধবাদের গতি কী হবে!"

এর উত্তরে সে যা বলল তা অনেক দুঃখ না পেলে কেউ কাউকে বলে না। অনেক দুঃখ আর গভীর দুঃখ। তার সঙ্গে কবিসুলভ বচনরীতি।

"দাদা, অপমানের তীব্রতম বিষে আমি অনুক্ষণ জ্বলে পুড়ে মরছি, কিন্তু মৃত্যুর শীতলতা আমার জন্যে নয়। আর এ কাঙালপনা এই ভিক্ষুকের বৃত্তি আমার সহ্য হয় না। এই ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট গ্রহণের মতো হীন লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মধিক্কারের শেষ নেই।

আত্মীয় স্বজন চায় শুধু নিঃশব্দে সয়ে যাওয়া, যতটুকু পাওয়া যায় তাই যথেষ্ট মনে করা। কিন্তু আমি সীতা সাবিত্রীর মতো আদর্শ নারী নই। আমার মর্যাদাবোধ আমাকে অনুক্ষণ গৃহত্যাগে প্রেরণা দিচ্ছে, কিন্তু আমি দুর্বলচিত্ত, সন্তানের জননী, তাই দুর্বল। তাই আজ আমি আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আপনি যদি পারেন আমাকে একটি কি দুটি সন্তান নিয়ে কোথাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের সুবিধে করে দিন। কারুর অনুগ্রহপ্রার্থী হতে আমি চাইনে। নিজের ক্ষত-বিক্ষত পরিশ্রান্ত মন নিয়েই যতটুকু পারি খেটে যাব। স্বচ্ছন্দে না হোক

স্বাধীন ভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি কোনো রকমে কাটিয়ে দেব, এই আমার ইচ্ছা। দুঃখ বেদনা আঘাত সমস্ত জীবন ভরে অনেক তো পেয়েছি, অপমান অমর্যাদা লাঞ্ছনা তাও তো কম সহ্য করিনি। বিশ্বাসের বদলে পেয়েছি প্রতারণা, আত্মসমর্পণের নামে পেয়েছি আত্মা হতে প্রিয়তরের কাছ থেকে ভিক্ষার ঝুলি। মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর হয় না।

তার পরে অনভিজ্ঞা বালিকার সরল অকুণ্ঠিত মনের উপর মিথ্যার ছলনার বলে অধিকার স্থাপন করে তাকে সর্বহারা করা কত বড় কৃতঘ্নের কাজ। যাক, নিষ্প্রয়োজন তার সমালোচনা। আপনার অনেক প্রভাব, অনেক প্রতিষ্ঠা। কোথাও একটা ব্যবস্থা কি আমার করে দিতে পারেন না? আত্মীয় স্বজন আমার বিন্দুমাত্র বিদ্রোহও সহ্য করবে না। আমার দুঃখে বেদনায় বিচলিত হবে না। চিরদিনই বাঙালীর ঘরে অত্যাচারের অপমানের প্রতিকার আত্মহত্যা ছাড়া কোনো কিছু নেই। কিন্তু আমি যে তিনটি ছেলেমেয়ের মা। সন্তানজননী। বুকের মধ্যে বড় বোঝা, বড় হাহাকার, বড় যন্ত্রণা। দাদা, আশ্চর্য, মৃত্যু আমাদের জন্যে নয়। দীর্ঘ জীবন ধরে জ্বলে জ্বলে তবে তো অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই বিধির বিধান। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার, সব আজ ফাঁকি সব আজ মিথ্যা। আমার চেয়ে ঐ ভিখারিণী তারও সম্মান আছে স্থান আছে। আমার কিছু নেই, দাদা, কিছু নেই। অজস্র চোখের জলে ভেসে এই শিক্ষা লাভ করেছি।"

বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেছল। শুনতে শুনতে আমার চোখেও। কিন্তু এত কথা শোনবার পরও শুনতে বাকী ছিল কী এমন হয়েছে যার-জন্যে সে আমার সাহায্যপ্রার্থী। স্বামীর কাছে অপমান হওয়া এমন কিছু অঘটন নয়। চাকরি করলে হয়তো সে অপমান এড়ানো যাবে, কিন্তু নতুন মনিব যদি অপমান করে তা হলে কী উপায়! আর

একটা চাকরি জোটানো কি এতই সহজ। আবার তো সেই স্বামীর বাড়ী ফিরে যেতে হবে। কেন তবে একটি গরীবের মেয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে? হেড মিসট্রেস কি আমাকে ক্ষমা করবেন? মনটাকে আমি শক্ত করলুম। কিন্তু মুখ ফুটে বললুম না কিছু।

নীলনয়না কাঁদছিল আর বলছিল, "আমার কিছু নেই দাদা, কেউ নেই। মা'র কাছে এক বছর ছিলুম। দেখলুম মা'র অন্য রূপ। তিনি তার জামাইকে অন্যায় করতে দেবেন, কেননা জামাই বড় মানুষ। আর এক্ষেত্রে জামাই তো পর হয়ে যাচ্ছেন না, জামাই হয়েই থাকছেন।"

ইঙ্গিতটা খুব সূক্ষ্ম। আমি ঠিক ধরতে পারলুম না জানতে চাইলুম, "তার অর্থ!"

সে লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলল, "আরো খুলে বলতে হবে?"

তখনো আমার মাথায় ঢুকছিল না যে আঘাতটা কেবল স্বামীর কাছ থেকে আসেনি, এসেছে আরেক জনের কাছ থেকেও, সেইজন্যে এত লাগছে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নীলা এক সময় বলে ফেলল, "আপনার জানা নেই সেই ছড়াটা?

নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর।"

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো যে এ মেয়ের সব চেয়ে যারা বিশ্বাসী ছিল সব চেয়ে তারা অবিশ্বাসী। তড়িৎস্পৃষ্টের মতো বলে উঠলুম, "ওঃ!" মনে হলো মূর্চ্ছা যাব। দু'হাতে চেপে ধরলুম চেয়ারের হাতল।

মা ধরণী! মা ধরণী! কত সহ্য করবে তুমি! কত সহ্য করবে পাপ তাপ বিশ্বাসঘাতকতা! তুমি দ্বিধা হও, আমরা সকলে তলিয়ে

যাই। অভিশপ্ত এই মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাক। বেঁচে থাকাটাই একটা মহা দুর্ভোগ। অথচ আত্মহত্যা করাটাও তো অপরাধ!

করুণ স্বরে বললুম, "নীলা, বোন আমার!"

আমার সমবেদনার স্পর্শ লেগে তার সঙ্কোচের তুষার গলে গেল। সে যা বলে গেল তা গুছিয়ে বললে এই রকম দাঁড়ায়। শিশু বয়স থেকে শিবপূজা করে সে যেমন বর চেয়েছিল তেমনটি পেয়েছিল। তেমনি রূপবান গুণবান বিদ্বান। উপরন্তু ধনবানও বটে, পুরুষানুক্রমে সাহেব বাড়ীর বেনিয়ান। এমন স্বামী বহু ভাগ্যে মেলে। কী করে যে তাকে ওদের পছন্দ হলো সেটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়। তার বাবা ছিলেন মস্তবড় কুলীন। তা না হলে এমন যোগাযোগ সচরাচর ঘটে না।

রোজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার প্রথম কাজ ছিল স্বামীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা। স্বামীর কল্যাণে সারাদিন আনন্দে কেটে যেত। এত সুখ কেউ কোনো দিন পায়নি। এমন সৌভাগ্য আর কোনো মেয়ের হয়নি। তার ইচ্ছা করত সবাইকে ডেকে এনে দেখাতে তার স্বামীকে, তার দেবতাকে, তার সৌভাগ্যকে। বালিকা বয়স, সরল মন। জানত না যে যারা তার সুখ দেখতে আসত তারাও সুখের ভাগ চাইত। তার আপন মায়ের পেটের বোন মীননয়না ছিল তাদের একজন।

মীনার বিয়ের কথা হচ্ছিল এক জায়গায়। দেখা গেল মীনা তাতে রাজী নয়। তার জামাইবাবুও নানা রকম আপত্তি তুললেন। মীনাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তার নাকি প্রতিভা আছে। অল্প বয়সে বিয়ে দিলে তার প্রতিভার ক্ষতি হবে। একদিন তার জামাইবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে তাকে লোরেটোতে দিয়ে এলেন।

তাদের সংসারে জামাইবাবুর যা প্রতিপত্তি তাঁর কথার উপর কথা বলে কার সাধ্যি।

এমনি করেই বিষবৃক্ষের রোপণ হলো। তখন কেউ বুঝতে পারেনি এর পিছনে কী আছে। মীনার পড়াশুনা শেষ হলে তারও এমনি সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে এই কথাই তখন সকলের মাথায় ঘুরছিল। এমনি বড় ঘরে। এমনি সৌভাগ্যবতী হবে সে।

মীনা মাঝে মাঝে আসত ও দিদির কাছে থাকত। সে সময় জামাই-বাবু তার সঙ্গে সম্বন্ধের সুযোগ নিয়ে রসালাপ করতেন। নীলা সরল মানুষ। সে তাতে দোষের কিছু দেখত না। কোনোদিন সন্দেহ করেনি যে সেটা নির্দোষ রসালাপ নয়। কিন্তু এক দিন তাদের দু'জনকে ছাদে বসে থাকতে দেখে তার বুকটা কেমন করে উঠল। সে বোনকে শাসন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা হলে স্বামী ভাবতেন তার মনটা বড় ছোট। তার মহত্ত্বের জন্যে ইতিমধ্যে সে অনেকের কাছে প্রশংসা পেয়েছিল। তার স্বামী বলতেন সে তার দাদের চেয়ে মহৎ। হবে না কেন, কত বড় কুলীন পরিবারের মেয়ে।

বোনকে শাসন করতে পারে না, স্বামীকে অনুযোগ জানাতে পারে না। তা হলে সে বেচারি করে কী! করে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা। করে একবেলা উপবাস। কানাকানি থেকে জানাজানি হয়ে যায় কেন হঠাৎ এই ধর্মে মতি। তার পরে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয় মীনাকে। চলে সে যেতই, কিন্তু এমন লজ্জার সঙ্গে নয়। তার চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আর একজন চললেন। স্বামী চললেন জার্মানী। সেখানে তিনি এক কারখানায় কাজ শিখবেন ও ফিরে এসে কারখানা খুলবেন। নীলা খুব কান্নাকাটি করল। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। তিনি বললেন, "দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমি কি তোমার স্বামীর সার্থকতার পথে অন্তরায় হবে? এই যে এরা রইল,

গোপাল আর নান্টু, তুমি এদের মানুষ করবে, এই তোমার কাজ। আর আমার কাজ হবে আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন যাপনের উপায় সন্ধান করা। এদের যেন ইংরেজের বেনিয়ান হতে না হয়।"

দুটো বছর দেখতে দেখতে নয়, বেশ টিকতে টিকতে কাটল! স্বামী ফিরলেন না। লিখলেন আরো এক বছর লাগবে। সে বছরটাও কাটল কোনো গতিকে। তার পরেও তিনি ফেরেন না। লেখেন আরো দেরি হবে। বেচারি নীলা অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে। তার বিরহপারাবারের যেন পার নেই। কোলের ছেলেদুটিকে নিয়ে থাকে। তারা যদি না থাকত তা হলে সে বোধ হয় বাঁচত না।

সাড়ে চার বছর পরে স্বামী ফিরলেন। তখন তাঁর অন্য রকম চেহারা। ভীষণ কাজের লোক। আর দস্তুরমতো সাহেব। যাদবপুরে কারখানা খুললেন। নতুন বাড়ী করলেন বালিগঞ্জে। বাড়ীতে তার বিদেশফেরতা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীরা আসেন। আসেন খাস বিদেশী সাহেব মেম। তাদের পার্টি দেওয়া, তাদের পার্টিতে যাওয়া হয়ে উঠল নীলার অন্যতম কাজ। কিন্তু সে তো এসব জানে না, বোঝে না। তার বিদ্যা-বুদ্ধিও সামান্য। সে যদি একটু ভুল করে উনি দারুণ রাগ করেন। যেন কী একটা মহাপাতক ঘটেছে। অমুককে ডানদিকে বসানোর কথা। কেন বাঁ দিকে বসানো হলো দাও এর কৈফিয়ৎ। দিতে না পারলে কথা-বার্ত্তা বন্ধ। বারো মাসের মধ্যে তেরো মাস তাদের বাক্যালাপ বর্জন।

একদিন নীলার হঠাৎ জ্বর এলো। জ্বরটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো টাইফয়েড। ভুগতে হলো মাস খানেক। তার পরে দুর্বলতা কাটাতে আরো মাস দুয়েক। ইতিমধ্যে তার একটি খুকু হয়েছিল। খুকুকে সামলাবার জন্যে ছুটে এলো মীনা। তখন সে কলেজ শেষ করে বাড়ীতে বসে আছে। মীনাকে পেয়ে নীলা বর্তে গেল। মাসীকে পেয়ে খুকুও খুব খুশি! মীনা যে কেবল বেবীর ভার নিল তা নয়, ধীরে ধীরে গোপাল

ও নান্টুর ভার নিল। নীলা তা জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হলো। তার পরে একে একে আরো অনেক কিছুর ভার নিল মীনা। পার্টিতে যাওয়া, পার্টি দেওয়া কিছুই বাদ গেল না তার বা তার জামাইবাবুর। সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলল, হয়তো আরো ভালো চলল, শুধু এক কোণে পড়ে রইল সংসারের অধিষ্ঠাত্রী।

নীলা যখন সেরে উঠল তখন অবাক হয়ে লক্ষ করল যে মীনা যেন এ বাড়ীর গৃহিণী, সে নিজে যেন গৃহিণীর দিদি। চাকরবাকরদের ব্যবহারও যেন বদলে গেছে, তারাও যেন ও কথা সমঝেছে। স্বামীর দিকে তাকালে মনে হয় না যে স্ত্রীর প্রতি তাঁর একটুও ভালবাসা আছে। যা আছে তা কর্ত্তব্যবোধ। আর শ্যালিকার প্রতি আছে সীমাহীন নির্ভরতা, অনুরাগ ও আকর্ষণ। নীলার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। ভগবানের কাছে সে নালিশ জানাল এই বলে, কেন তাকে মরতে দেওয়া হলো না, কেন বাঁচিয়ে রাখা হলো? তা কি এই দৃশ্য দেখবার জন্যে।

মীনাকে সে বিদায় দিতে পারল না। দিলে সংসার চালাতে পারত না। তা ছাড়া মহত্ত্বের প্রশ্ন ছিল। তার মতো মহীয়সী নারী কেমন করে নিজের বোনকে সন্দেহ করবে, নিজের স্বামীকে সন্দেহ করবে। মীনা তার জন্যে যা করেছে তার জন্যে কোথায় কৃতজ্ঞ হবে, না অকৃতজ্ঞের মতো ঝগড়াঝাটি করে তাড়িয়ে দেবে? তার পর তার স্বামী কি তাকে ক্ষমা করবেন? অমন করে কি দেবতার মন পাওয়া যায়? আর তিনি যদি দেবতা না হয়ে থাকেন, তা হলে কি মানুষের মন পাওয়া আরো কঠিন নয়?

আবার সেই কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ হলো। এক বেলা উপবাস। খাট থেকে নেমে গিয়ে মেজের উপর শোয়। ঘুম আসে না। চোখের জলে ভাসে। সৌভাগ্যবতী বলে একদিন সে কত গর্ব বোধ করত। এখন

তার মতো হতভাগিনী কে আছে! তার বাড়ীর ঝিরাও তার চেয়ে সুখী। তারা সকলে সে কথা জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা করে। হায়, এত বড় অপমান ছিল তার কপালে! সে মরে গেল না কেন? আত্মহত্যা করে না কেন?

কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে কারুর কোনো পরিবর্তন হলো না, স্বামীর তো নয়ই, মীনারও না। মাঝখান থেকে সে নিজেই আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। ডাক্তার দেখে বলে গেল অমন করলে ছেলেমেয়েরা মাতৃহীন হবে। কথাটা তার প্রাণে বিঁধল। তাই তো। ছেলেমেয়েদের মাতৃহীন হতে দেওয়া কি ভালো? কী তাদের অপরাধ? কেন তারা এত কম বয়সে মাতৃহীন হবে? মা-হারা বাছাদের কেউ কি একটু ভালোবাসবে, আদর করবে? মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ তো জানাই আছে। বাপের দরদের কথা বলে কাজ নেই। তার ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে তাকে বাঁচতে হবে, তাকে সবল হতে হবে। তার নিজের জীবন না হয় ব্যর্থ হয়েছে। তা বলে তার সন্তানদের কচি প্রাণগুলি কেন কুঁড়িতে শুকিয়ে যাবে?

শরীরে কিছু বল পেতেই সে চলল তার বাপের বাড়ী। বাপকে তো এসব কথা বলা যায় না। বলল মাকে। মা শুনে কাঁদলেন। মীনাকে ডাকিয়ে এনে বকলেন। মীনা বলল গান্ধর্ব মতে তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে তার স্বামীর ঘরে আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে তর্ক করবে কে? মা বললেন, "এবার আমার মরণ হলে বাঁচি।" বাপ বললেন, "আমারও।" লজ্জায় ঘৃণায় নীলার ইচ্ছা করছিল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সব যন্ত্রণা জুড়াতে। কিন্তু সে যে মা। অসহায় শিশু তিনটিকে মাতৃহীনী করে কার হাতে দিয়ে যাবে? ঐ ডাইনী মাসীর হাতে?

একে একে উদ্‌ঘাটিত হলো, লোরেটোতে পড়বার সময় পড়ার সমস্ত খরচ জোগাতেন জামাইবাবু। তার পর কলেজে পড়বার সময় জার্মানী থেকে আসত পড়াশুনার খরচ জামাইবাবুর কাছ থেকে। মা'র ধারণা

ছিল নীলা এসব জানে। সেইজন্যে তাকে জানানো হয়নি। জামাইবাবু যে কেন এতটা করছেন তখন এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। সকলে জানত তিনি নীলাকে ভালোবাসেন। নীলার বোনকে পড়ানো সেই ভালোবাসার অঙ্গ। আগে জানলে কি কেউ তার সাহায্য নিত?

নীলা আশা করেছিল যে মা বাবা মীনার দোষ ধরবেন, মীনাকে ও বাড়ীতে যেতে দেবেন না, তার গান্ধর্ব বিবাহকে অস্বীকার করবেন, অন্য কোনোখানে তার প্রাজাপত্য বিবাহের নির্বন্ধ করবেন। কিন্তু তাঁরা তেমন কিছু করলেন না। বললেন, "এ তোমাদের মামলা। তোমরা যেমন করে পারো মেটাও।"

মা বাপের কাছে এমন ব্যবহার কেউ কি কখনো দেখেছে? তা দেখার পরও নীলা তাঁদের বাড়ীতে ছিল, থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কোথায় একটু সহানুভূতি পাবে, না সমালোচনা শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল! মীনাকে ও-বাড়ীতে প্রথম নিয়ে গেল কে? বোনকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার দরকারটা কী ছিল। তাকে দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা জামাইবাবুর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হলো কেন? নিজে কি চোখের মাথা খেয়েছিল? পুরুষ মানুষের মনে কী আছে তা যদি তার স্ত্রী বুঝতে না পারে তবে আর কে বুঝবে? মীনাকে দোষ দেওয়া বৃথা। সে তখন ছেলেমানুষ। কিসে কী হয় জানত না, বুঝত না। নীলার উচিত ছিল তাকে শেখানো, সমঝানো।

হায়, নীলাই বা তখন কত বড়! চোদ্দ বছরের বালিকা। স্বামী-গরবে গরবিনী। গর্বের দ্বারা অন্ধ। তা ছাড়া এমনিতে সে সরল মানুষ। সবাইকে বিশ্বাস করে, কাউকে সন্দেহ করে না। নিজের স্বামীকে সন্দেহ করবে! সন্দেহ করবে মায়ের পেটের বোনকে! ওরা তার স্বভাব-সরলতার সুযোগ নিয়েছে, বিশ্বাসপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দোষ নীলার নয়, দোষ ওদের দু'জনের। বিশেষ করে স্বামীর।

বছর খানেক বাপের বাড়ী থেকে নীলা হাঁপিয়ে উঠল। কী একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে মার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। তখন সে চলল তার শ্বশুরবাড়ী। বালিগঞ্জের বাড়ী নয়, তালতলার বাড়ী। যে বাড়ীতে সে বৌ হয়ে যায়। শাশুড়ী তাকে আদর করে নিলেন। শ্বশুর বললেন দোষ তার নয়, দোষ তাঁর ছেলের। ছেলেকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করবেন এসব কথা নীলার কানে সুধা বর্ষণ করল। এতদিন পরে বেচারি একটু সহানুভূতি পেলো। সমালোচনা শুনতে হলো না। মনে হলো নিজের রাজত্বে ফিরে এসেছে। এখানে সে সুখে না হোক সোয়াস্তিতে থাকবে।

কিছুদিন পরে অনুভব করল যে শ্বশুরবাড়ী আর স্বামীর বাড়ী নয়। এক কালে এ বাড়ীতে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে বাস করেছে। এখন যদি কোনো অধিকার থাকে তবে তা স্ত্রীর অধিকার নয়, হতভাগিনী পুত্রবধূর অধিকার। প্রতিবেশিনীরা এসে করুণা জানিয়ে যান, অভ্যাগতাদের কণ্ঠে কারুণ্য ধ্বনিয়ে ওঠে। শাশুড়ী ননদ জা সকলের মুখে সমবেদনার বাণী। এমন কি বাড়ীর ঝি চাকর পর্যন্ত হায় হায় করে। কয়েক মাস পরে নীলার অসহ্য বোধ হলো। কেন? এত দয়া কিসের? সে কি বিধবা না পতিপরিত্যক্তা? সে স্বেচ্ছায় পতিগৃহ থেকে চলে এসেছে, ইচ্ছা করলে আবার সেখানে যেতে পারে। কেউ তাকে বারণ করেনি যেতে। ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে কেন এত অনুকম্পা?

এর পরে তার আর ভালো লাগল না শ্বশুরের অন্ন খেতে। মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ইচ্ছা করল একবার সেই লোকটির সঙ্গে বোঝা পড়া করতে যে তাকে অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ করেছিল। একদিন কাউকে কিছু না বলে হাজির হলো বালিগঞ্জের বাড়ীতে। হঠাৎ তাকে দেখে মীনার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা খসে পড়ল! মীনা উঠে গিয়ে

শোবার ঘরের ভিতর ঢুকে খিল দিল। যেন শোবার ঘব বেদখল হতে যাচ্ছে। নীলাব সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলতে। স্বামীকে একা পেয়ে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল সেই আগেব মতো। বলল, "দেবতাব মতো তোমাকে পূজা করতুম। তার কি এই পবিণাম। কেন তুমি আমাকে বঞ্চনা করলে?"

স্বামী এর উত্তরে আমতা আমতা করলেন। যা বলবেন তাব থেকে বোঝা গেল তিনি মীনার জন্যে চিন্তিত। মীনা যদি ঘবে খিল দিয়ে আত্মহত্যা করে তা হলে কী সর্ব্বনাশ হবে। এই বলে তিনি উঠে গিয়ে দরজায কান পাতলেন। নীলাও গেল তাঁর সঙ্গে। কান পেতে শুনতে পেল মীনা কাঁদছে। তার বেশী কিছু নয়। স্বামী কিন্তু তাইতেই ব্যাকুল। দরজায় ঘা দিযে বললেন, "মীনা, লক্ষ্মিটি। খুলে দাও। তোমার দিদি তোমাকে দেখেই চলে যাবে। খুলে দাও।" মীনা তা শুনে আরো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। দবজা খুলল না।

নীলা বলল, "আচ্ছা, কান্না কি ওর একচেটে? আমি কি কখনো কাঁদিনি? সাড়ে চার বছব তুমি জার্মানীতে ছিলে। প্রতিদিন সাবা রাত কাঁদিনি আমি? এখনো কাঁদছিনে? কেন তা হলে তুমি এত আকুল হচ্ছ? এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

কথাবার্তা জমল না। স্বামী সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। নীলা তাঁকে অভয় দিল যে মীনা আত্মহত্যা করবে না। সে এমন মেয়ে নয় যে দিদির জন্যে আত্মঘাতী হবে। তাতেও যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন না, তখন বলল, "আচ্ছা দাঁড়াও। তোমার মীনাকে দিয়ে এখুনি দোর খোলাচ্ছি। .. মীনা, আমি চললুম রে। গোপালেব বাবাকেও নিয়ে যাচ্ছি।"

সত্যি সত্যি দ্বার খুলল। মীনা ছুটে বেরিয়ে এলো।

তার পরে যা ঘটল তা অপরিকল্পিত। কী যে ভূত চাপল তার ঘাড়ে, নীলা ঠাস ঠাস করে দুই চড কষিযে দিল মীনার দুই গালে। বলল,

"পোড়ারমুখী, এত পড়াশুনা করে তোর এই বুদ্ধি! তিনটি ছোট ছোট নিরীহ শিশু, তাদের কাছ থেকে তাদের বাপকে কেড়ে রাখবি।"

মীনার গায়ে এমন কিছু লাগেনি। কিন্তু মনে লেগেছিল খুব। সে আছাড় খেয়ে পড়ল ও বোধ হয় মূর্চ্ছা গেল। স্বামী তা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে "ডাক্তার" "ডাক্তার" বলে ছুটোছুটি বাধিয়ে দিলেন। নীনা যেই মীনার মুখে চোখে জল দিতে গেল অমনি তাকে হটিয়ে দিয়ে বললেন, "গেট আউট।" এক ঘর চাকরবাকরের সামনে সে যে কী অপমান, কী লজ্জা, তা ভোলবার নয়। নীনা আর কী করে, স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করার বিন্দুমাত্র আশা নেই দেখে সুড় সুড় করে সরে পড়ে।

স্বামীর বাড়ীর পথ রুদ্ধ। এই ঘটনার পর আর সেখানে ফিরে যাবার কথা ভাবা যায় না। শ্বশুরবাড়ীতে যত দিন ইচ্ছা থাকা যায়। তাঁরা গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবেন না। গোপালের জন্যে, নাণ্টুর জন্যে, বেবীর জন্যে একটা আয়া রাখতে যত খরচ তার চেয়ে কম খরচ করলে যখন মা পাওয়া যায়। হাঁ, তার চেয়ে কম খরচে। তাঁদের খরচের হাত ক্রমশ কমে আসছিল।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে বিনা অধিকারে আয়ার মতো কত দিন থাকা যায়! এত দিন তার মনে অভিমান ছিল, আর যাই হোক সে স্বামী পরিত্যক্তা নয়, সে স্বেচ্ছায় চলে এসেছে। কিন্তু এবার তো সে কথা বলা যায় না! এক ঘর মানুষের সামনে তার স্বামী তাকে "গেট আউট" বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ কী তার অপরাধ! সে কি তবে তার নিজের বোনকে শাসন করতে পারবে না। হায়, যদি সময় থাকতে শাসন করত।

এর পরে সে অনেক ভেবেছে। ভেবে কোনো কূল কিনারা পায়নি। স্বামীসুখ তার অদৃষ্টে যতটুকু ছিল ততটুকু। তার বেশী নেই। বোনের অমঙ্গল কামনা করেও ফল নেই। মীনা মারা গেলে লোকটা হয়তো আর কাউকে বিয়ে করবে। আর কোনো বিদুষীকে, যে ডান হাতে

ছুরি ও বাঁ হাতে কাঁটা ধরতে জানে, যে অসভ্যের মতো শব্দ করে খায় না। মীনার মঙ্গল হোক, সে আয়ুষ্মতী হোক, স্বামীসোহাগিনী হোক। প্রাজাপত্য বিবাহের পর সন্তানবতী হোক। মীনার সুখে তার আপত্তি নেই। কিন্তু তার নিজের সুখের কী হবে। চিরটা কাল কি সে গোপাল নাণ্টুর বেবীর আয়া হয়েই কাটাবে। আর কোনো সার্থকতা নেই তার বিড়ম্বিত জীবনে?

তার এই জিজ্ঞাসার উত্তর কেউ তাকে দেয় না। বই পড়তে পড়তে আপনি উত্তর পায়। সে স্বাবলম্বী হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। নিজের জীবন নিজের মতো করে কাটাবে। বিবাহে সুখী হয়নি বলে জীবনে সুখী হবে না কেন? জীবন কি আরো বড় নয়?

বলতে বলতে প্রিয়দর্শনদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন, "শুনলে তো নীলনয়নার প্রশ্ন? বিবাহে সুখী হয়নি বলে জীবনে সুখী হব না কেন? কবে সেই বৈদিক যুগে এমনি এক প্রশ্ন করেছিলেন মৈত্রেয়ী। তার পর পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে। ভারতের মেয়েরা চুপ করে সহ্য করতে শিখেছে। মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে সাহস পায়নি। পঞ্চাশ শতাব্দীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করল এই মেয়ে।"

আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করলুম আর কোনো মেয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন করেছে কি না। কই, মনে তো পড়ল না।

দাদা বলতে লাগলেন—

ম্যাট্রিক কোয়ালিফিকেশন ছিল না বলে ওরা ওকে ইস্কুলের চাকরি দিতে নারাজ। বলে, ইন্সপেক্ট্রেস নামঞ্জুর করবেন। আমি গিয়ে ইন্সপেক্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার নাম শুনেছিলেন। নীলার ইতিহাস শুনে সহানুভূতি জানালেন। বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাধা যদি আসে ডিপার্টমেণ্টের দিক থেকে আসবে না। আসবে সমাজের দিক থেকে। তখন হয়তো বেচারির চাকরি যাবে।

হলোও তাই। নীলা চাকরি পেলো, উপরওয়ালারা অনুমোদন করলেন, স্বয়ং হেড মিস্ট্রেস তার পড়ানোর প্রশংসা করলেন। আমরা তো ভাবলুম বিপদ কেটে গেছে। এমন সময় চিঠি এলো শাশুড়ীর অসুখ। নাতনিকে দেখতে চান। পত্রপাঠ তাকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নীলার সঙ্গে ছিল তার মেয়ে বেবী। কোলের মেয়ে বলে ওরা তাকে এত দিন নীলার সঙ্গে থাকতে দিয়েছে। গোপালের জন্যে,

নান্টুর জন্যে যখন মন খারাপ হয় তখন বেবীকে কোলে চেপে ধরে সে সান্ত্বনা পায়। বলতে গেলে সেই তার একমাত্র সান্ত্বনা। বেবী যদি চলে যায় তা হলে সে কাকে নিয়ে থাকবে? কী নিয়ে থাকবে? চাকরি কি এতই সুখের!

এলো আমার কাছে পরামর্শ চাইতে। সে লাবণ্য, সে দীপ্তি আর নেই। একটি দিনের একটুখানি ফুঁ লেগে নিবে গেছে। কোথায় জীবনের সুখ! সমস্ত দিন পরের মেয়েদের পড়িয়ে দু'বেলা স্বহস্তে পাক করে কতটুকু সময় পায় নিজের মেয়ের সঙ্গে বসবার! সেটুকুও আর পাবে না খুকু যদি চলে যায়। একবার গেলে কি আর ফিরে আসবে? ছাড়বে ওরা তাকে?

আমার পা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ডুকরে কাঁদল। যেন আমি সর্বশক্তিমান। যেন রাজা ক্যানিউটের মতো সমুদ্রকে হুকুম করতে পারি, সমুদ্র, তুমি হটে যাও। শ্বশুরবাড়ী, তোমার হাত সরিয়ে নাও। বেবীকে তুমি ছুঁয়ো না। বেবী শুধু তার মা'র।

বললুম, নীলা, বোন আমার। সন্তান কি তোমার একার? তার ওপর কি তার পিতৃকুলের অধিকার নেই? ওঁরা দেখতে চান। ভালোয় ভালোয় দিয়ে এসো। কিছুদিন পরে ভালোয় ভালোয় নিয়ে এসো। আইন ওঁদের পক্ষে। ঝগড়া করে পারবে কেন?

ঝগড়া করতে ওর একটুও ইচ্ছা নেই। কিন্তু ওর প্রাণে ভয় ওরা হয় খুকুকে ফিরে আসতে দেবে না। তা ছাড়া খুকুকে পাঠাবে কার সঙ্গে? মাকে ছেড়ে খুকু কার সঙ্গে যাবে? নীলাকেই তা হলে যেতে হয় স্বয়ং। কিন্তু যাবে কোন মুখে? ওঁরা তো তাকে যেতে বলেননি। কই, চিঠির কোনোখানে কি এমন কথা আছে?

বাস্তবিক, চিঠিতে অমন কোনো কথা ছিল না। আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে শাশুড়ীর যখন অসুখ তখন তারও তো একটা কর্তব্য আছে।

শাশুড়ীর সম্পর্ক তো চুকে যায় নি। একবার গিয়ে দেখা আসা উচিত নয় কি ?

হেড মিস্‌ট্রেসও সেই পরামর্শ দিলেন। নীলা তার মেয়েকে নিয়ে কলকাতা গেল। গিয়ে দেখল যা ভেবেছিল তাই। শাশুড়ীর অসুখের খবর মিথ্যে। নাতনিকে দেখতে চাওয়া একটা ফাঁদ। আসলে উনি ওকে রাখতে চান নিজের কাছে। ইতিমধ্যে গোপালকে ও নান্টুকে ওদের বাপ এসে নিয়ে গেছে বালিগঞ্জের বাড়ীতে। ঠাকুমা ঠাকুরদা তাই চান আর একটি খেলার সাথী। সেইজন্যে তলব করেছেন নাতনিকে। ন'লার যদি মেয়েকে ছেড়ে থাকতে ভালো না লাগে তা হলে সেও এসে মেয়ের কাছে থাকুক তালতলার বাড়ীতে। মফঃস্বলে চাকরি করবার এমন কী কারণ ঘটেছে ? মিছিমিছি সকলের মাথা হেঁট।

শাশুড়ী নীলাকে ভালোবসতেন। মীনাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। নীলা যদি তাঁর কাছে থাকত তা হলে তিনি একবার চেষ্টা করে দেখতেন তাঁর ছেলে তালতলার বাড়ীতে ফিরে আসে কি না। মীনাকে বালিগঞ্জের বাড়ীতে রেখে আসে কি না। বেশীর ভাগ সময় নীলার সঙ্গে ও মাঝে মাঝে মীনার সঙ্গে বাস করে কি না। কিন্তু এই মর্মে আপোশ করতে নীলার রুচি ছিল না। সেকালের মেয়েরা স্বামীকে বেশীর ভাগ সময় কাছে পেলে বাকী সময়টা সতীনের কাছে যেতে দিত। কিন্তু নীলা হচ্ছে একালের মেয়ে। সে ষোলো আনা পাবে কিম্বা ষোলো আনা হারাবে। "আমার স্বামী" যদি বলতে না পারে "আমার স্বামী নয়" বলবে। কিন্তু "আমাদের স্বামী" বলবে না।

স্বামী যদি তার না হয়ে থাকে শাশুড়ীও তার নন। তাঁর কাছে থাকার প্রস্তাবে নীলা রাজী হতে পারল না। কর্মস্থলে ফিরে এলো। কিন্তু বেবীকে রেখে আসতে বাধ্য হলো। সেবার গোপালকে ও নান্টুকে। এবার বেবীকেও। এ যে কী দুঃখ তা কাউকে বোঝানো

যায় না, কেউ বুঝবে না। বিধবার একমাত্র সন্তান মারা গেলে যে দুঃখ এ কি তার চেয়ে কিছু কম! হায়, তার জীবনে সুখ কোথায়!

নীলা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত এ কথা আমার জানা ছিল। কিন্তু সে যে হঠাৎ একদিন মূর্চ্ছা যাবে এতদূর আমি কল্পনা করিনি। একজন শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠাতে হলো। এবার গেল বাপের বাড়ী। আর ফিরে এলো না।

তার স্বাবলম্বনের পরীক্ষা ব্যর্থ হলো। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে গলগ্রহ হতে হবে, হয় বাপের বাড়ীতে, নয় শ্বশুরবাড়ীতে। বাপের বাড়ীতে কেউ তাকে চায় না, তার চেয়ে বরং মীনার আদর বেশী, কারণ মীনা মাঝে মাঝে উপহার পাঠায়। ইতিমধ্যে মীনার বিয়ে হয়ে গেছে। তার কলঙ্কের দাগ মুছে গেছে। তার পরিচয় দিতে কেউ লজ্জিত নয়। লজ্জা যা কিছু তা নীলার জন্যে। সে যে পতিপরিত্যাগিনী বা পতি-পরিত্যক্তা। উঠতে বসতে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে তার উপযুক্ত স্থান হয় বালিগঞ্জ, নয় তালতলা। বেলেঘাটায় তার স্থানাভাব।

এই যখন তার বাপের বাড়ীর অবস্থা তখন শ্বশুরবাড়ী থেকে ডাক এলো শ্বশুরের সেবা করতে। এবার সত্যি সত্যি বাঘ এসে পড়েছে। ভদ্রলোক বহু দিন রক্তের চাপ থেকে ভুগছিলেন। এবার কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। নীলা গেল সেবিকা হয়ে। মীনাও এলো। কিন্তু সেবিকা হয়ে নয়। সেবার ব্যবস্থা দেখতে। স্বামী এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখলেন। নীলার সঙ্গে তাঁদের দু'জনের চোখাচোখি ঘটল। কিন্তু কথাবার্তা হলো না।

শ্বশুরকে বাঁচানো গেল না। তাঁর মৃত্যুর পর শাশুড়ী ধরে বসলেন নীলাকে তাঁর কাছে থাকতে হবে। নীলা এবার 'না' বলতে পারল না। সে জানত না যে তার স্বামীকেও বলা হয়েছে তালতলার বাড়ীতে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে। তিনি বেশীর ভাগ নয়, কিছু সময় কাটাতে

রাজী হয়েছেন। তার চেয়ে বড় কথা, গোপালকে নান্টুকে ফেরত দিতে তাঁর অমত নেই। নীলা যদি স্বয়ং তাদের ভার নেয়।

তিনটি ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পেয়ে তার মুখে আবার হাসি ফুটল, গান গেয়ে উঠল তার মন। পারে কখনো কেউ এদের ছেড়ে বেঁচে থাকতে! এতদিন বেঁচে আছে কী করে। মনে হলো ওটা একটা দুঃস্বপ্ন—ওই যে নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান জীবন। আনন্দে আছে, এমন সময় একদিন তার স্বামী এসে হাজির। তিনি নিজের থেকে তার কাছে মাফ চাইলেন। বললেন, দোষ আমার নয়, দোষ তোমারি। কেন তুমি অন্যান্য স্ত্রীদের মতো হিংসুটে হলে না, কেন আমাকে পাহারা দিলে না, কেন আসতে দিলে আমার কাছে তোমার বোনকে! তুমি মহৎ, সেইজন্যে তোমার এ দুর্ভাগ্য। এখন আমার কর্তব্য কী আমাকে বলো।

এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। এই স্তব স্তুতির জন্যে। তার সাধারণ জ্ঞান লোপ পেলো। সে স্বামীর কোলে সারা রাত কাটালো। যখন ভোর হলো তখন খেয়াল হলো যে এ মানুষ থাকতে আসেনি, এ মানুষ পুরুত ঠাকুরের মতো আর এক জায়গায় গিয়ে আর এক মন্ত্র আওড়াবে।

তারপর এও তার খেয়াল হলো যে এরকম যদি চলতে থাকে তা হলে আবার একটি খোকা বা খুকী হবে। কিছুতেই তা হতে দেওয়া উচিত নয়। যে লোকটি তাকে এত দুঃখ দিয়েছে তার জন্যে সে আবার গর্ভযন্ত্রণা সইবে। মীনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এমন কী সুখ যার জন্যে সে আর একটি শিশুকে সংসারে আনার ও মানুষ করার দায়িত্ব বহন করবে! কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।

পরের বার তার স্বামী যখন এলেন তখন সে নিজের জন্যে মাদুর পাতল মেজেতে। তিনি অবাক হলেন, কেননা তাঁর ধারণা ছিল নীলারই আগ্রহ বেশী। সে যেন তাঁকে লুট করে নিতে চেয়েছিল মীনার কাছ থেকে। হঠাৎ কী হলো তিনি বুঝতে পারলেন না। অপেক্ষা করলেন।

বৃথা অপেক্ষা। নীলা তার মন স্থির করে ফেলেছিল চিরকালের মতো। সে তার স্বামীকে বরাবরের জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে তার বোনকে। স্বামীর উপর তার কোনো স্বত্ব অবশিষ্ট নেই। ইনি তার বোনের স্বামী, তার নন।

এসব কথা তাঁকে মুখ ফুটে বলতে ইচ্ছা ছিল না। বলতে হলো যখন তিনি পরের বার পীড়াপীড়ি করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যবহার বদলে গেল। তিনি বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিলেন। ভয় দেখালেন যে আবার নিয়ে যাবেন গোপালকে ও নান্টুকে। বেবীকেও। এককালে যাঁকে দেবতার মতো পূজা করেছে তাঁর মূর্তি দেখে তার ভক্তি চটে গেল। সে বলল, তোমার ছেলেমেয়েদের তুমি নিয়ে যাবে, এর জন্যে আমার অনুমতির দরকার করে না। কিন্তু এই দেহটা তোমার নয়, আমার। আমার গায়ে হাত দেবার আগে আমার অনুমতি নিতে হবে। সে অনুমতি তুমি ইহজন্মে পাবে না। এই আমার শেষ কথা।

এতবড় সাহস তার হবে, কোনোদিন সে কল্পনাও করেনি। কোন অদৃশ্য উৎস থেকে এলো এ সাহস! স্বামীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। কী যে এর পরিণাম একবার চিন্তা করল না। সত্যি কি সে পারে তার নান্টু গোপালকে ছেড়ে তার খুকুকে ছেড়ে বাঁচতে! আত্মহত্যা। আত্মহত্যাই আছে তার কপালে। তাই যদি হয় বিধাতার লিখন তবে তাই হবে। কিন্তু মীনার স্বামীকে সে আর নিজের স্বামী বলে স্বীকার করবে না।

এই ঘটনার পর প্রত্যেক দিন সে প্রত্যাশা করছিল এখনি নান্টু গোপালকে নিতে গাড়ী আসবে। বেবীকে নিয়ে যেতে লোক আসবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। তার কারণ তখন জানতে পায়নি, পরে জানতে পেলো। মীনা ওদিক থেকে বাধা দিচ্ছিল নীলার ছেলেমেয়েদের ভার নেবার প্রস্তাবে। মীনা মা হতে যাচ্ছে, নিজের সন্তানের কথা

ভাববে, না পরের সন্তানের জন্যে ভেবে মরবে। স্বামী আর কী করেন, নীলার কাছে হার মানলেন। মুখে নয়, মনে। নীলা শ্বশুরবাড়ীতেই রয়ে গেল।

এরপরে তার স্বামী নতুন একটা ব্যবস্থা করলেন। সকাল আর সন্ধ্যা কাটালেন তালতলায়, দিনের বেলাটা কারখানায়, রাত্তিরটা বালিগঞ্জে। আট ঘণ্টা, আট ঘণ্টা, আট ঘণ্টা। ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গ পেয়ে মানুষ হবে, এই জন্যে তালতলায় সকাল সন্ধ্যা কাটানো। নীলার খাতিরে নয়। নীলা তা বুঝতে পেরেছিল, সানন্দে সায় দিয়েছিল। নীলার উপর তাঁর কোনো অন্যায় দাবি-দাওয়া ছিল না। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে নীলার উপর জোরজুলুম খাটবে না। প্রয়োজনও ছিল না। যা ছিল তার নাম পুরুষালি জেদ। আত্মাভিমান।

নীলার সেই প্রশ্ন কিন্তু সমস্তক্ষণ উত্তর অন্বেষণ করছিল। সে বিবাহে সুখী হয়নি বলে কি জীবনে সুখী হবে না? এই কি জীবনের সুখ? শ্বশুরের ভিটায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকা, ছেলেমেয়েদের নাওয়ানো খাওয়ানো ইস্কুলে পাঠানো, স্বামীর সঙ্গে দুটো সংসারের কথা বলা ও জমাখরচের খাতা নিয়ে বসা, শাশুড়ীকে সেবাযত্ন করা। এ ভাবে জীবন যাপন করতে ভালো লাগে না। মনে হয় এর মধ্যে বিকাশের পরিসর নেই। বিকাশ যদি চায় তবে বাইরে যেতে হবে। গেছল যেমন একদিন।

সব চেয়ে তার খারাপ লাগত রাত সাড়ে নয়টার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়ে স্বামী যখন চলে যেতেন বালিগঞ্জ। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ফিরে আসতেন। ওরা ঘুম থেকে জেগে দেখত বাবা আছেন বাড়ীতেই। এ অভিনয় ক'দিন চলতে পারে! মীনারও তো খোকা হবে। সেও তো তার বাপকে চাইবে ঘুম থেকে জেগে দেখতে। আর গোপালেরও তো বোঝবার বয়স হয়েছে। সে কি বোঝে না, ভাবছ? বোঝে বলেই তো দিন দিন কেমনতর হয়ে যাচ্ছে।

তারপর নীলা যাই বলুক না কেন তার ভিতরকার নারী কোনো দিন ক্ষমা করেনি। কার স্বামী রোজ রাত সাড়ে নয়টার সময় অন্যত্র যায়, ভোর সাড়ে পাঁচটার আগে ফেরে না! যাদের নাইট ডিউটি তাদেরও সারা মাসটা সারা বছরটা নাইট ডিউটি নয়। একটা রাতও কি কামাই করবার জো নেই! নীলা অবশ্য ধরাছোঁয়া দিত না। তার অসিধার ব্রত। তবু একসঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করা যেত। ছেলেদের সম্বন্ধে গল্প। দেশ-বিদেশের গল্প।

নীলা ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। মীনার ছেলে হবার পর স্বামীর স্নেহ যেন মীনার ছেলের উপর পড়ল বেশী। তিনি সকালবেলাটা মীনার ওখানেই কাটাতে লাগলেন। রাতটাও। সন্ধ্যাবেলা এসে গোপাল নাণ্টুর পড়াশুনা তদারক করে যান। বেবীর সঙ্গে খেলা করে যান। নীলাকে দিয়ে যান টাকা। ব্যস্, তা হলেই কর্তব্য করা হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কি এর ফলে সুখী হলো?

এমন সময় এলো সমুদ্রের ডাক। নদী, উপনদী, শাখানদী, যে যেখানে ছিল শুনতে পেলো ডাক। আমি শুনতে পেলুম উত্তর বঙ্গে, নীলা শুনতে পেল কলকাতায়। কেউ কারো পরামর্শের জন্যে অপেক্ষা করলুম না। ছুটে বেরিয়ে পড়লুম সমুদ্রের পানে। গান্ধীজী চললেন ডাণ্ডী। আমি চললুম মহিষবাথান। নীলা চলল ডায়মণ্ড হারবার। লবণ প্রস্তুত করা একটা উপলক্ষ্য। আমাদের সকলের লক্ষ্য বৃহত্তর জীবন, স্বায়ত্ত জীবন। আমরা চাই জীবনের সুখ। দিগন্তবিসারী নিঃসীম নীল সাগর, তুমি দেবে জীবনের স্বাদ। সুখ তোমাতেই।

গুলির জন্যে, লাঠির জন্যে তৈরি ছিলুম আমরা। তুচ্ছ হাতকড়া পরে তেমন কোনো সুখ হলো না। দারোগাকে বললুম, কোমরে দড়ি নেই কেন? নিয়ে আসুন দড়ি। শক্ত করে বাঁধুন। দারোগার চোখে জল। ধন্য গান্ধী, হিরণ্যকশিপুকেও কাঁদালে। আমার বিচার

করলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আমি তাঁকে হাত জোড় করে বললুম, আমাকে চরম দণ্ড দিন। অন্তত দু'বছর। পরাধীন দেশে আমি ফিরে আসতে চাইনে। ফিরলে ফিরবো স্বাধীন ভারতে। তিনি আমাকে একবছর সাজা দিলেন। লক্ষ্য করলুম তিনি উত্তেজনায় কাঁপছেন। যেন তাঁরই বিচার হলো, আমার নয়। হাঁ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সেদিন আমরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করলুম।

আমি জানতুম না যে নীলাও যোগ দিয়েছে, তারও জেল হয়েছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর একটা জনসভায় দেখি কে একটি মেয়ে সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে চুক্তির বিরুদ্ধে বলছে। চিনতে পারলুম। নীলা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হলুম তাকে দেখে, তার উক্তি শুনে। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সে যখন বলল, গান্ধীজী তাঁর সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দেখলুম একপাল ছেলেমেয়ে তাকে বাহবা দিচ্ছে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু দেখলুম তার কয়েকজন দাদা জুটেছেন। তাঁরাই তার কানে মন্ত্র দিচ্ছেন। নইলে নীলা কখনো গান্ধী-নিন্দা করত না।

আমার একটুও রুচি ছিল না তার সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে। চলে যাচ্ছিলুম, পিছন থেকে একটি ছেলে এসে আমার হাতে একখানা চিরকুট দিল। নীলা আমাকে ডেকেছে। গেলুম ফিরে। তার দাদাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে নমস্কার জানালুম। তারপর এক সময় বলল, তুমি যেয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শ্বশুরবাড়ী থেকে সে ডায়মণ্ড হারবার যায়। সেখান থেকে যায় জেলে। জেল থেকে ফিরে আজ এ দাদার বাড়ী, কাল ও দাদার বাড়ী, পরশু এ দিদির বাড়ী, তরশু ও দিদির বাড়ী ঘুরছে। গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে এই আশায় যে পুলিশে তাকে আবার ধরবে, তখন কিছুদিনের জন্য বাসস্থানের অভাব হবে না। গান্ধীজী যদি চুক্তি না করতেন তাহলে সে আরো কিছুকাল শ্রীঘর বাস করত। তাকে অকালে নিরাশ্রয় করেছেন

বলেই সে গান্ধীজীর নিন্দা করছে। আমি তার দশা দেখে দুঃখিত হলুম। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের জন্য নিত্য ভাবে। তাদের সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। মনকে বোঝায়, দেশের জন্যে কতো মেয়ে ঘর সংসার ছেড়ে সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছে। সেও তাদের একজন। হয়তো তাকে একদিন প্রাণ দিতে হবে। তখন কি সে ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে পেছপাও হবে? তাদের এমন কিছু অযত্ন হচ্ছে না। ক্ষতি যা হচ্ছে শরীরের নয়, মনের। তার জন্যে দায়ী তাদের বাপ। তাদের মা দেশের জন্যে লড়াই করছে বলে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। নইলে তাদের কালো মুখ তারা কাকে দেখিয়ে বেড়াত! একদিক থেকে দেখতে গেলে নীলা তাদের ক্ষতিপূরণ করছে।

সেই আমাদের শেষ দেখা। তার আরো একডজন দাদা জুটেছে। আমাকে তার কিসের প্রয়োজন! আমি বললুম, নীলা, তুমি যা ভালো মনে করো তা করে যাও। আমার সমর্থনের জন্য অপেক্ষা কোরো না। যদি কোনদিন বিপদে পড় আমার সাহায্য চাইলেই পাবে। যদি আমার সাধ্য থাকে।

আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। চিঠিপত্র পেয়েছি। নীলা আবার জেলে যায়, কিন্তু হঠাৎ বেবীর গুরুতর অসুখ শুনে মুচলেকা দিয়ে বাড়ী আসে। তারপরে বেবী তাকে ধরে রাখে। তখন থেকে সে শ্বশুরবাড়ীতেই আছে। রাজনীতি করে না। তবে সেই যে তার বাইরে ঘোরার অভ্যাস হয়েছে সে অভ্যাস যায়নি। বারো মাসে তের পার্বণের মতো দেশের জন্যে চাঁদা তোলার বিচিত্র উপলক্ষ্য রয়েছে। চ্যারিটির নামে টিকিট বিক্রী করতে হলে নীলার ডাক পড়ে। ওতেই ওর জীবনের সুখ। কখনো বিশেষ কোনো বিপদে পড়েনি। যদি পড়ে আমাকে জানাবে। তবে আমার মনে হয় না যে ওর স্বামীর দিক থেকে আর কোনো বিপদ আসতে পারে।

এই বলে দাদা শেষ করলেন।

আমি কিছু মন্তব্য করব কি-না ভাবছি এমন সময় দাদা আপনা থেকেই বললেন, "নীলার চেয়ে নীলার প্রশ্ন আরো মূল্যবান। নীলাকে একদিন ভুলে যাব। ভুলব না তার প্রশ্ন। বিবাহে যদি সুখী না হই, জীবনে সুখী হব না কেন? তুমি হলে এর কী উত্তর দিতে?"

ভেবে বললুম, "এর উত্তর বিবাহে যদি সুখী না হই, জীবনে সুখী হতে চেষ্টা করব। কিন্তু সে চেষ্টা যদি সফল না হয় তা হলে আশ্চর্য হব না। ছেলেমেয়ে যদি থাকে তারাই সে চেষ্টা বিফল করবে।"

একথা শুনে দাদা বললেন, "এই নিয়ে আর একটি মেয়ে আমাকে আর একটি প্রশ্ন করেছিল। শুনে চমকে উঠেছিলুম। দুঃসাহসিকতায় নীলার প্রশ্নকেও ছাড়িয়ে যায়। বাস্তবিক, পঞ্চাশ শতকের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভারতের মেয়েরা এখন সবাক্ হয়েছে।"

তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বললেন, "এমন প্রশ্ন কেউ কোনো দিন করেনি। শুনবে?" এর পরে তিনি যা বলবেন আপাতত তা অপ্রকাশ্য।

আমি হেসে বললুম, "অবাক হবার পালা এখন ভারতের ছেলেদের।"

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন, "অবাক হতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করতে পারিনে যে এসব প্রশ্ন হাজার হাজার বছরের পুরানো প্রশ্ন। এতকাল অবদমিত অবস্থায় ছিল। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না বলে এতকাল যাদের গুণগান করা হয়েছে তাদেরই এক আধজন এখন অবদমনের প্রভাব কাটিয়ে উঠছে।"

এই গৌরচন্দ্রিকার পর আরম্ভ হলো রানীর গল্প। রানী তাঁর নাম নয়, তাঁর পরিচয়। তাঁর স্বামীকে লোকে রাজা বলে। আসলে জমিদার। জেল থেকে ঘুরে এসে প্রিয়দর্শনদা চাকরির খোঁজে ছিলেন। নিধুবাবু ইতিমধ্যে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন, দাদার চিঠির জবাব দিলেন না।

আরো কয়েক জায়গায় চিঠি লেখালেখির পর রাজার কাছ থেকে নিয়োগ-পত্র এলো। তিনি ছিলেন সাহিত্য-যশপ্রার্থী। দাদাকে দিয়ে তাঁর সাহিত্যের কাজ করিয়ে নেবেন বলে প্যালেস স্থপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট পদে নিযুক্ত করলেন। প্রিয়দর্শন হলেন পরিদর্শনসচিব।

রাজবাড়ীতেই তাঁর বসবাসের আয়োজন হলো। মাসীর জন্মে হলো অন্য বন্দোবস্ত। জীবনে তিনি এমন আরাম পাননি। রাজবাড়ীর ভৃত্য-বাহিনী সর্বদা তাঁর ভয়ে তটস্থ। একটা করতে বললে দশটা করে দেয়। খাবার জন্মে ডাক পড়ে খোদ রাজা বাহাদুরের সঙ্গে। পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের কয়েকটি পদ স্বয়ং রানীমার হাতের তৈরি। রানীর হাতের রান্না ক'জনের ভাগ্যে জোটে? প্রিয়দর্শনই বোধ হয় এদেশের একমাত্র কবি যিনি এক আধ দিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবেলা ওবেলা রানীর হাতে খেয়েছেন। এর জন্মে তিনি গর্বিত।

এর জন্মে তাঁকে অনন্য দাম দিতে হয়েছে। রাজার নামে যে সব কবিতা মাসিক পত্রে বেরিয়েছে তার অধিকাংশই প্রিয়দর্শনের রচনা। কয়েকটা রানীর খসড়া, প্রিয়দর্শনদার যোজনা। হাতের লেখাটা রাজ-হস্তের। রাজার স্বকীয়তা এই পর্যন্ত। এই দামটা না দিলে এই সৌভাগ্যটা হতো না। এর জন্মে দাদা লজ্জিত।

রানীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হতে বহুকাল লাগল। রাজবাড়ীতে নয় অবশ্য। কিন্তু সে কথা পরে। তবে প্রতিদিন রান্না খেতে খেতে, রান্নার তারিফ করতে করতে, নিজের বিশেষ প্রিয় ব্যঞ্জনের ফরমাস করতে করতে রানীর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠল সেটা রাঁধুনির সঙ্গে খাইয়ের সম্পর্ক নয়। দাদার সঙ্গে বোনের সম্পর্ক বললে বোধ হয় ভুল হয় না, তবে ঠিকও হয় না। এটা একটা অনির্দেশ্য সম্পর্ক। কোথাও এর কোনো তুলনা নেই।

প্রিয়দর্শনদার মনে রং লেগেছিল। সেটা গোপন করতে গিয়ে তাঁর গালেও রং লাগল। একটু থিতিয়ে নিয়ে বললেন, "তখন কি ছাই জানতুম! পরে জানতে পেলুম রানীর জীবনে ওটা একটা চরম মুহূর্ত। ততদিনে যা হবার হয়ে গেছে।"

আমি কৌতূহল চেপে রাখতে পারলুম না। সুধালুম, "তার মানে ?

"তা হলে বলি শোনো।" এই বলে তিনি জমিয়ে বসলেন। বললেন—

আমার জীবনে এই নিয়ে চার বার হলো। নারী বিপন্ন। নাইটের সহায়তা চায়। যেন আমার অদৃষ্টে আর কিছু লেখেনি। হাসিও পায়, রাগও ধরে। যেমন জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু তেমনি নারীদের বন্ধু প্যারীবাবু। হিন্দুস্থানী দারোয়ানেরা আমাকে প্যারেবাবু বলে ডাকত।

রাজবাড়ীতে বেশ আনন্দে আছি, লিখছি পড়ছি লেখা সংশোধন করছি, হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এলো অন্দর থেকে। একটা সাহিত্যিক রচনার ভিতর গোঁজা। রানীর হাতের লেখা। "বিপদে পড়ে আপনার কাছে হাত পাতছি। যদি দয়া করেন। আমার ভাই নীপু আমার সর্বনাশ করতে বসেছে। কথা শুনছে না। যদি তাকে বুঝিয়ে বলেন। একমাত্র আপনাকেই সে যা একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে।"

ইচ্ছা করল লিখি, "আচ্ছা, আমার যথাসাধ্য করব, তাতে যদি আপনার বিপদ কাটে। কিন্তু রানীর সঙ্গে আমার চিঠি চলাচল হচ্ছে এ কথা যদি কেউ রাজার কানে তোলে—তুলবেই—তা হলেই

হয়েছে আমার চাকরি। চাকরি তো যাবেই, মান নিয়ে টানাটানি। শুধু কি মান নিয়ে! প্রাণ নিয়ে কি-না তাই বা কে বলবে। কারণ রাজা লোকটা যেমন ভালো তেমনি খারাপ। মনিব হিসাবে চমৎকার, বন্ধুর মতো ব্যবহার করে কিন্তু মানুষ হিসাবে আর পাঁচজন জমিদারের মতো অত্যাচারী লম্পট। শোনা যায়, একজন শরিককে মেরে তার মৃতদেহ বাড়ীতেই পুঁতে রেখেছে। কিন্তু প্রমাণ নেই। থাকলেও তার চেয়ে জবর জিনিস আছে। নগদ টাকা। টাকায় রাতকে দিন করতে পারে। সুতরাং কাজ কী লোকটাকে চটিয়ে।

চিঠির জবাব দেওয়া হলো না। জবাব না পেয়ে রানী কী মনে করলেন জানিনে। দ্বিতীয় বার অনুরোধ এলো না। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ধরে নিলুম যে ভাইবোনের ঝগড়া মিটে গেছে। বিপদ কেটে গেছে।

ভাইটাকে আমি দেখেছি। কলকাতায় থাকে। মাঝে মাঝে আসে, দু-পাঁচ দিন হৈ হৈ করে যায়। উদ্দামতার অবতার। বনেব পাখী থেকে ঘরের বৌ-ঝি কেউ তার নেকনজর এড়ায় না। শিকারী স্বভাব। আমাকে কিন্তু দূর থেকে নমস্কার করে। কেন বুঝতে পারিনে। অথচ রাজাকে ভয় করে না। বরং রাজাই তার ভয়ে তটস্থ।

কিছু দিন পরে শুনি রানী কলকাতা গেছেন। বাপের বাড়ী। বেশ ভালো। সেইখানেই ভাইবোনের ঝগড়া মিটুক। আমি কেন এর মধ্যে মাথা গলাতে যাই? তবে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। জীবনে এমন ঘটনা ক'বার ঘটে? রানী আমার কাছে উপযাচিকা। নিশ্চয় ঘোরতর বিপদ। নইলে কি তিনি আমার কাছে হাত পাততেন?

তারপর তিনি আর ফিরে আসেন না। এক মাস যায়, দু'মাস যায়। রাজাকেও খুব খুশি মনে হলো না। বাড়ীতে মেয়েমানুষ আনতে তাঁর সাহসে কুলোয়নি, মা বেঁচে আছেন, ছেলেমেয়েরাও বোঝে। কিন্তু শিকারের নাম করে বাইরে যেতে বারণ করবে কে? শিকারে

গেলে তিনি শিবিরে রাত কাটান, সঙ্গিনীর অভাব হয় না, নিত্য নতুনের পরশ পান। কাজেই রানী না থাকলে তাঁর খুশি হবার কথা। তবু দেখা গেল তিনি ভাবনায় পড়েছেন।

যাক, আমাকে তো আর বলবেন না। আমার কী! আমি চুপচাপ থাকি। কেবল রান্নাটা মুখরোচক হয় না। তফাৎ বুঝতে পারি। সাহিত্যিক রচনা আসে না সংশোধনের জন্যে। সেটাও একটা মনে রাখবার মতো তফাৎ। দু'জনের মধ্যে একটা সাহচর্যের ভাব গড়ে উঠেছিল। দু'জনে মিলে বই লিখলে যেমন হয়। সেটা বাধা পেলো। বইখানা অসমাপ্ত থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

একদিন নীপু এসে হাজির হলো। তাকে দেখে চেনা যায় না। একদম নিবে গেছে। রাজার সঙ্গে তার কথাবার্তার টুকরোটাকরা আমার কানে এলো। রানী পাগল হয়ে গেছেন। তাঁকে কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ দেখলে তাঁর পাগলামি বেড়ে যায়। এখন কি নিজের সন্তানকে দেখলে তাঁর মাথায় খুন চাপে। রাজাকে দেখলে আস্ত রাখবেন না। রাজা যেন তাঁর ত্রিসীমানায় না যান।

আমার মনে বিষম আঘাত লাগল। হায়! তখন যদি জানতুম তাঁর কী বিপদ! তা হলে কি তাঁর চিঠির উত্তর না দিয়ে পারতুম! পাগল হয়ে গেলেন রানী! পাগল হয়ে গেলেন! এর জন্যে কি আমার কোনো দায়িত্ব নেই! নিজের উপর আমার রাগ ধরে গেল। নীপুর উপর আরো বেশি। সর্বনেশে ছোকরা কী যে করেছে কে জানে!

কিন্তু যতই তাকে এড়াতে যাই ততই তার দিকে ঝুঁকি। কী যে করেছে কে জানে! ইচ্ছা করে জানতে। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, কিন্তু নিজের ভাবান্তর লক্ষ্য করে আমি নিজেই চমকে

উঠলুম। যেন নীপুর সঙ্গে কথা না বলে আমার সোয়াস্তি নেই। সেই একমাত্র লোক যে বলতে পারে কী হয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে কী করে কথাটা পাড়ি এই ভেবে হিমশিম খাচ্ছি এমন সময় সে নিজের থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এলো।

বাঁচা গেল। গম্ভীর ভাবে শুনে গেলুম তার কথা। যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার। নীপু বলল, "আপনার কাছে একটু কাজে এসেছি। দয়া করে যদি আমার কথা শোনেন।"

"নিশ্চয় শুনব। আপনি নির্ভয়ে বলে যান।"

"আমাকে 'আপনি' কেন? 'তুমি' বললেই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করব। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। দিদি তো আপনাকে দেবতার মতো ভক্তি করত। কিন্তু আমার ওসব সাহিত্য টাহিত্য আসে না। যেন আমাকে ফেল করাবার জন্যে ওসবের সৃষ্টি। নাটক ছাড়া আর কিছু আমি বুঝিনে, বুঝতে পারিনে। উপন্যাসও না। গল্পও না। কবিতা তো নয়ই। অথচ মজা দেখুন, চিনির বলদের মতো আমারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল ওসব। বলেছিল তোর কাছে এগুলো রাখিস। দেখতে দিস্‌নে কাউকে। খবরদার, খবরদার, জামাইবাবুকে দিস্‌নে দেখতে। দেখলে সর্বনাশ হবে।"

এবার আমি গম্ভীর ভাবে জানতে চাইলুম, "কেন?"

"কে জানে কেন!" নীপু অজ্ঞতার ভান করল।

কিন্তু আমার অভিনয় তার চেয়ে এক কাটি সরেস। আমি বোকামির ভান করলুম। নীপু যখন বুঝতে পারল যে আমার মতো নীরেট এ জগতে বেশী নেই তখন আশ্বস্ত হলো। বলল, "জামাইবাবুর উপর আপনার অসীম প্রভাব। যদি দয়া করে তাঁকে শান্ত করার ভার নেন তা হলে কৃতজ্ঞ হব। তিনি হয়তো এখনি কলকাতা যেতে চাইবেন। কিন্তু গেলে কি দিদিকে দেখতে পাবেন?"

আমি বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। নীপু আমাকে বিশ্বাস করে কানের কাছে মুখ এনে বলল, "দিদি থাকলে তো দিদিকে দেখতে পাবেন ?"

"য়্যাঁ !" আমি আঁতকে উঠলুম। রানী নেই ? মারা গেছেন তা হলে ? হায়, হায় ! কেন তাঁর চিঠির উত্তর দিইনি তখন !

"আপনি যা ভয় করেছেন তা নয়।" নীপু কুণ্ঠিত হাসি হাসল। "দিদি বেঁচে আছে ঠিক। কিন্তু কলকাতায় নেই। কোথায় আছে তা কেউ জানে না। আশা করছি ফিরে আসবে দু'দিন বাদে। ততদিন জামাইবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে হবে। বাচ্চাদের ভুলিয়ে রাখার ভার আমরাই নিয়েছি।"

তাজ্জব ব্যাপার ! রানী গৃহত্যাগিনী ! কিন্তু কেন ?

আমার মতো গাধা নীপু কখনো দেখেনি। তাই আমাকে বিশ্বাস করে বলল আরো গোপন কথা। আসলে হয়েছিল এই যে নীপু একজনের প্রেমে পড়েছিল। সেই একজন আর কেউ নয়, তার দিদির জা। মেয়েটিও তাকে ভালোবাসত। কিন্তু কড়া পর্দা। কী করে দেখা হবে দু'জনের ? দিদির ঘরে। দিদি প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু নীপুর হাতে দিদির সেই সব রচনা ছিল। নীপু যদি সেগুলো তার জামাইবাবুকে দেখায় তাহলে দিদির সর্বনাশ হবে। কেননা তাতে প্রেমের কথা আছে।

তার পর শুধু দেখা পেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে না। আরো নিকট করে চাইবে। তাতে দিদির প্রবল আপত্তি। কিন্তু নীপুর যেন নেশা চেপে গেছে। দিদিকে বলে, যাই, লেখাগুলো জামাইবাবুকে দেখতে দিই।

রানী বলেন, তুমি আমার লেখা ফেরৎ দাও। নীপু বলে, তুমি আমাদের মিলন ঘটিয়ে দাও। ...কেউ কারো কথা শোনে না।

এই যখন পরিস্থিতি তখন রানী চলে যান বাপের বাড়ী। তার পরে

যা ঘটে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নীপুর এক বন্ধু ছিল তার নাম কঙ্ক। তাকেই তিনি ডেকে পাঠালেন নীপুর অসাক্ষাতে। কঙ্ক তার পর থেকে নীপুকে দিক করতে থাকল। নীপু আমল দিল না। তখন কঙ্ক একদিন তালা ভেঙে নীপুর ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিল দিয়ে নীপুর বাক্স খুলে লেখাগুলো মেজের উপর স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কে একজন গিয়ে নীপুকে ডাকে। নীপু পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে ও কঙ্ককে খুন করতে যায়। কঙ্ক আর সে যাত্রা প্রাণে বাঁচত না, যদি না দিদি ছুটে এসে মাঝখানে পড়তেন। মারের চোট যা লাগল তা দিদির গায়ে।

এর পর থেকে দিদির উপর নীপুর রাগ বাগ মানল না। আর কঙ্ককে তো সে খুঁজে বেড়াতে লাগল মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে। শুনতে পেতো রানীর সঙ্গে কঙ্ক লুকিয়ে দেখা করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কিন্তু সেখানে তো তাকে আক্রমণ করা যায় না। নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলতে থাকে নীপু। ওদিকে যে ওরা পালাবার প্ল্যান আঁটছে এ খবর তার জানা ছিল না। গুপ্তচরের মুখে যখন জানতে পেলো তখন খুব দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে ওরা বম্বে মেলে উঠে বসেছে ও ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

ই. আই. আর. বম্বে মেল। তার থেকে বোঝা যায় না কোন্ দিকে গেল। বম্বে না জব্বলপুর না এলাহাবাদ না আর কোথাও। জাহাজে চড়ে বিলেত গেল কি না কে জানে। কঙ্ক বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। রানীর চেয়ে বয়স তার কম। এখনো বিয়ে হয়নি। বিলেত যাবার আশা রাখে। কিন্তু সে যে শেষ কালে এই কর্ম করবে তা কি কেউ কোনো দিন ভেবেছে। এই লজ্জার কথা নীপু কাউকে জানায়নি। কঙ্কদের বাড়ীর লোক জানে সে চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছে। আর নীপুদের বাড়ীর লোক যেটুকু জানে সেটুকু এই যে দিদি একাই নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

নীপুর এখন জীবনে ধিক্কার এসে গেছে। নিজের উপরেই তার রাগ হয়। না হবেই বা কেন! যাকে সে কামনা করেছিল তাকেও তো আর কোনো দিন পাবে না। পর্দার অন্তরালে চিরকালের মতো হারিয়েছে। তাই তার মন খারাপ। দিদির কথা শুনলে আর কিছু না হোক চোখের দেখাটুকু হতো। এখন এখানে এসে দেওয়ানার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি দৈবাৎ চার চোখ এক হয়। না, তা হবার নয়। শাশুড়ী বুড়ী অন্দরে ঢুকতে দেবে না। দিদির বড় মেয়েকে দেখতে চাইলে দেখতে দেবে না।

নীপুর কাহিনী আর আমার ভালো লাগছিল না শুনতে। ভাবছিলুম তখন যদি রানীর চিঠির জবাব দিতুম, যদি জানাতুম, ভয় কী! আমি আছি। তা হলে কি এত দূর গড়াত! হায়, মানুষ তো সর্বজ্ঞ নয়। রানীকে দোষ দেওয়া সোজা। রানীকে বলি কেন, নারীকে দোষ দেওয়া সোজা। কিন্তু নারীর বিপদের দিনে মাথা দিতে পারে ক'জন! আমি তো পারিনি। কেমন করে দোষ দিই তা হলে! না, আমি দোষ দেব না।

এখন থেকে আরো একটি মানুষ ভাবনায় পড়ল। সে প্রিয়দর্শন ভদ্র। রানী আমার কে! কেন তা হলে আমি ভাবি! ভাবি এইজন্যে যে কঙ্ক নামক একটি ভেলা অবলম্বন করে রানী নামের একটি মেয়ে অকূলে ভেসেছে। দুনিয়া যে কেমনতর জায়গা সে জ্ঞান তো নেই। ঐ কঙ্কই হয়তো একদিন ভক্ষক হবে। কিম্বা আর কেউ হবে যে কঙ্ককে দেবে ভাগিয়ে। হয়তো এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচবে। হয়তো নিয়ে তুলবে বেশ্যালয়ে। হা ভগবান!

কেন চিঠির উত্তর দিইনি বলে নিজের উপর আমি দিন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলুম। এখন বুঝতে পারছি ওটা অহেতুক। বাস্তবিক আমার কিছু করবার ছিল না। কিন্তু তখনকার দিনে হৃদয়টা ছিল কোমল।

কোথাও কোনো নারী বিপদে পড়েছে শুনলে আমার ভিতরকার নাইট লাফ দিয়ে উঠত। ইসলাম বিপন্ন শুনলে যেমন মুসলমান সেটা গায়ে পেতে নেয় নারী বিপন্ন শুনলে তেমনি নাইট সেটা নিজের করে নেয়। আমি থাকতে এত বড় একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হবে! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব! না, না, না। আমাকে ঝাঁপ দিতেই হবে আগুনে, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। পৌরুষের অগ্নিপরীক্ষায়।

রাজার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। ই. আই. আর. বম্বে মেল হাওড়া থেকে আমাকে নিয়ে চলল পশ্চিমে। ব্রেক জার্নি করতে করতে চললুম। কে জানে যদি হঠাৎ সন্ধান পেয়ে যাই! কয়েকটা ভুল সন্ধান পেয়ে বিভ্রান্ত হলুম। অবশেষে পৌঁছে গেলুম ভোপাল রাজ্যে।

হাঁ। ভোপালেই তারা ছিল। ছিল এক বাঙালী মুসলমান পরিবারে। সুফিয়ান সাহেব ভোপাল সরকারে কাজ করেন। কঙ্ককে আগে থেকে চিনতেন। কঙ্ক তাঁকে ছোট বেলা থেকে চাচা বলে ডাকত। হিন্দুর পক্ষে হঠাৎ কাজ পাওয়া মুখের কথা নয়। তিনি চেষ্টা করছেন। কঙ্ক আবার মুসলমান হবে বলে ক্ষেপেছে। তাতে তাঁর আপত্তি। রানীকে মুসলমানী করে মুসলমান মতে বিয়ে করতে চায় কঙ্ক। তাতেও তিনি নারাজ। সাহস থাকে তো হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করুক ওরা। সাহস না থাকে তো যে যার ঘরে ফিরে যাক। হিন্দুসমাজের সমস্যা থেকে পালাবার পথ নয় ইসলাম।

সুফিয়ান সাহেব আমার নাম শুনেছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হলেন। তখন তিনি মুসলমান নন, আমি হিন্দু নই। আমরা দু'জনে বাঙালী। প্রবাসী বাঙালীরা বাঙালী দেখলে বর্তে যায়। মুসলমান না হিন্দু—এ প্রশ্ন ওঠে পরে। আর এর জন্যে কিছু আসে যায় না। সুফিয়ান সাহেব সহজেই আমার কাছে মন খুললেন। বললেন, মেয়েটি কে তা আমি জানিনে, জানতে চাইনে। আপনি তাঁর আত্মীয়,

তাঁর খোঁজে এত দূর এসেছেন। আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমি তাঁর হিতৈষীর কাজ করেছি। এর জন্যে তিনি আমার উপর অভিমান করেছেন, হয়তো ভাবছেন আমার মতলব ভালো নয়, হয়তো আমিই তাঁর অনিষ্ট করব। কিন্তু আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন যে সমস্যা যেখানে সমাধানও সেইখানে। চাই মনের জোর। আমাদের মুসলমান সমাজে কি এ ধরনের ঘটনা ঘটছে না? তা বলে ক্রিশ্চান হতে যায় কেউ?

সত্যি তাই। মুসলমান কখনো সমাজের বাইরে গিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজে না। হিন্দু কেন তবে তা খোঁজে? রানীর সঙ্গে যখন আড়ালে দেখা হলো আমি বললুম, বোন, তোমার দুঃখ আমি বুঝি। আর কেউ যদি তোমাকে আশ্রয় না দেয় আমি দেব আশ্রয়, নিঃস্বার্থ ভাবেই দেব। মনে কোরো না আমার কোনো অভিসন্ধি আছে। কিন্তু লড়তে হবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে। পালিয়ে গিয়ে বোরখায় মুখ ঢাকলে চলবে না।

রানী আমার সঙ্গে কথা বলতে কুণ্ঠিত হলেন। ধরা পড়ে গেছেন বলে লজ্জিত ও বিব্রত। কিন্তু আমি যে তাঁর দাদা এটুকু স্বীকার করে নিলেন। বললেন, দাদা, ভালো আছেন তো?

তাঁকে কথা কওয়ানো সে দিন সম্ভব হলো না। দেখলুম তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা অদৃশ্য ব্যবধান খাড়া রয়েছে। তিনি রানী। আমি প্যালেস সুপারিন্টেন্ডেন্ট। না হয় সাহিত্যিক। কিন্তু আপনার লোক নই।

পরোপকার করতে গেলে এই রকমই হয়ে থাকে। যদি বিপদের দিন সাহায্য করতুম তা হলে আমার কথা তাঁর কানে সুধাবর্ষণ করত। আমাকে অত কথা বলতেও হতো না। কিন্তু তা যখন করিনি তখন আমার কথা তাঁর প্রাণে পুলক সঞ্চার করবে কেন?

কন্ধ আমাকে দেখে খুশি হলো আমি বাঙালী বলে। কিন্তু সন্দিগ্ধ হলো আমার কথাবার্তা শুনে। রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন রানীকে নিয়ে যেতে বা রাণীর সন্ধান নিতে। আমি রামের আজ্ঞাবহ হনুমান। আমার নিজের যেটা বক্তব্য সেটা একটা ছল। জমিদারের কর্মচারী আমি, মনিবের স্বার্থই আমার স্বার্থ। হায় পরোপকারী!

কী করে তাদের বোঝাই যে আমি নিজের খরচে নিজের খেয়ালে এত দূর এসেছি শুধু একটু উপকার করতে! কে বিশ্বাস করবে আমি একজন নাইট! ভাবলুম যাই চলে। যা করবার তা সুফিয়ান সাহেবই করবেন। তাঁর মতো মুরুব্বি থাকতে অহিত হবে না। কিন্তু ভোপাল রাজ্যে মোল্লা মৌলবীর তো অভাব নেই। চাকরির আশা দিয়ে কে যে কখন কলমা পড়ায় তার ঠিক কী!

উঠেছিলুম সেখানকার ডাক বাংলায়। বেশী দিন থাকার উপায় ছিল না। চিঠি লিখলুম দু'জনকে দু'খানা। লিখলুম, আমি শত্রুপক্ষের লোক নই। আমার দ্বারা তাদের ক্ষতি হবে না। রানীর বিপদের দিন সহায় হইনি বলে আমার মনে খেদ ছিল। সেই খেদ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এতটা পথ। কেউ জানে না যে আমি এসেছি। কেউ জানবেও না যে আমি এসেছিলুম। তারা যদি বিয়ে করতে চায় করবে। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার বুকে বাজবে তাদের সমাজত্যাগ। গৃহত্যাগ আমাকে তেমন বিচলিত করে না সমাজত্যাগ যেমন করে। তবু ভালো যে তারা অপর একটি সমাজের আশ্রয়ে বাস করবে, একেবারে নিরাশ্রয় হবে না। অসামাজিক হবে না। সে যে আরো ভয়ানক। আমি অন্তত এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হব যে তারা অকূলে ভাসবে না।

আমি আশা করিনি যে আমার চিঠি পেয়ে তাদের মনের ধারা বদলে যাবে। কিন্তু যে বাণী অন্তর থেকে উঠেছে তাকে অবিশ্বাস করা শক্ত। কন্ধ ও রানী দু'জনেই এলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। কন্ধ

বলল, আপনি আমাদের কী করতে বলেন? আমি তৎক্ষণাৎ এর কোনো উত্তর দিতে পারলুম না। তাই তো। কী করবে এরা? ফিরে যাবে? ফিরে গিয়ে তার পরে কী করবে? আমি সময় চেয়ে নিলুম ভাবতে। কঙ্ক বলল, আচ্ছা, আমি বাইরে বসছি। আপনি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি আপনাকে সমস্ত ঘটনা গোড়া থেকে বলবেন।

নির্জন ঘরে আমরা দুটি মানুষ মুখোমুখি বসে। রানী আর আমি। ভাই-বোন বলে আমাদের পরিচয়। কিন্তু আমরা ঠিক তা নই। আমরা একই লেখার দুই লেখক, দু'জনে মিলে লিখি। সেই সূত্রে অন্তরঙ্গ সহচর।

বয়স তাঁর কত হবে! সাতাশ-আটাশ। বয়সের অনুপাতে আরো তরুণ দেখায়। হাঁ, সুন্দরী। তন্বী। গায়ের রং জুঁই ফুলের মতো শাদা ও তাজা।

বললেন, আমার বিয়ে হয় এগারো বছর বয়সে। রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হবে এমন ভাগ্য কল্পনা করিনি। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে জন্ম। কী দেখে ওদের পছন্দ হলো জানিনে। বোধ হয় আমার রূপ। ছেলে-বেলা থেকে যার কাহিনী শুনে এসেছি এই সেই রাজপুত্র। রাজকন্যা নই, তবু রাজপুত্র আমাকে বিয়ে করেছে। আমার মতো সৌভাগ্য-বতী কে!

এ কথা ভেবে আমার মাটিতে পা পড়ত না। দিন কেটে যেত আত্ম-গৌরবে। কিন্তু এটা যেমন আমার আত্মগৌরব তেমনি আর এক রকম আত্মগৌরব ছিল আমার স্বামীর। ছি ছি, সেসব কথা মুখে ধরবার নয়। তবু আপনাকে বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। নইলে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন।

অনেক রাত করে বাড়ী আসত। আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে নিজের কীর্তিকলাপ শোনাত। আজ অমুক রূপসীকে ভোগ করে

এলুম। আজ অমুক অমুকের সঙ্গে রাসলীলা হলো। আজ শিকার ফসকে গেল, কাল আবার ফাঁদ পাততে হবে। অবশ্য নেশার ঘোরে বলত। এমনিতে বেশ মুখ মিষ্টি।

এগারো বারো বছর বয়স। কোন কথার কী অর্থ তাই ভালো জানা ছিল না। বড় ননদের বিয়ে হয়েছে। তার কাছে বললে সে হেসে কুটি কুটি হতো। জ্ঞান যতই হতে লাগল ততই অসহ্য বোধ হতে লাগল। ভেবেছিলুম ছেলেমেয়ের বাপ হলে আর ওসব করবে না। কিন্তু চার বছর পরে দুই ছেলেমেয়ের মা হয়েও আমাকে শুনতে হতো পতিদেবতার লীলাপ্রসঙ্গ।

শাশুড়ী দোষ ধরতেন আমার। আমি আমার স্বামীকে সামলাতে জানিনে। মেয়েমানুষ বেঁধে রাখতে না জানলে পুরুষমানুষ তো উড়বেই। একেই বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। আমার পড়াশুনা অল্প। বুদ্ধি তার চেয়েও কম। কী করে স্বামীকে সামলাতে হয় তা কেমন করে জানব! নাপতিনীর কাছে পরামর্শ চাইলুম। চাইলুম খোপানীর কাছে। গয়লানীর কাছে। ময়রানীর কাছে। এরা আমাকে যেসব পরামর্শ দিল সেসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখলুম। বশীকরণের কোনো কলা বাকি রইল না। ষোলো কলা পূর্ণ হলো। পুরো পাঁচ বছর কাল এই সমস্ত করে ফল হলো আরো দুটি সন্তান। কিন্তু স্বামীর চরিত্র যথাপূর্ব।

এই বার এ বাড়ীতে এলো আর একটি বৌ। আমার জা। নিয়ে এলো নতুন জীবনের স্বাদ। এক রাশ বাংলা বই ও মাসিকপত্র। এত দিন ওসব চোখে দেখিনি। স্বামী দেখতে দিতেন না। নভেল পড়লে মেয়েরা খারাপ হয়ে যায় এই ছিল তাঁর ধারণা। আর মাসিকপত্র কেনা তো বাজে খরচ। আমার জা কিন্তু ওতে ডুবে থাকত। আমার দেওর বারণ করত না।

রানী তাঁর নতুন জীবনের বর্ণনা দিয়ে বললেন, এবার আর রাজপুত্রের স্বপ্ন নয়। এবার কাল্পনিক নায়কের ধ্যান। যে আমাকে ভালোবাসবে। যে আমাকে জাগাবে। মা হয়েছি বটে, কিন্তু প্রিয়া তো এখনো জাগেনি। যে নারী মা হয়েছে সে কি কোনো দিন প্রিয়া হবার আনন্দ পাবে না?

কল্পলোকের গল্প ভাবি। ভাবতে ভাবতে সাধ যায় লিখতে। অশিক্ষিত হাতের লেখা। ইচ্ছা করে পড়ে শোনাতে, প্রকাশ করতে। সাহস হয় না।' স্বামী জানতে পেলে আস্ত রাখবে না। বিয়ের আগে নাকি একজন শরিককে মেরে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। লাশ নাকি বাড়ীতেই পোঁতা। স্ত্রীকে নিঃশেষ করা তার চেয়েও সোজা।

লিখি, লিখে আমার ভাই নীপুকে দিই লুকিয়ে রাখতে। পরে এক সময় অন্য নামে প্রকাশ করা যাবে। নীপুর উপর আমার অসীম বিশ্বাস। তার আর যাই দোষ থাক সে বিশ্বাসঘাতক নয়। কিন্তু এমন দিন এলো যেদিন দেখা গেল সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যদি না আমি তার হীরা মালিনী হই। বিদ্যা হচ্ছে আমার জা। সুন্দর হচ্ছে আমার ভাই। বুঝতে পেরেছেন?

আমারই ঘরে হঠাৎ এক বার এক মিনিটের জন্যে তাদের দেখা হয়ে যায়। সেই থেকে তাদের ভাব। আমার জা আমাকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। কিন্তু তার মনের কথাও তো আমি আঁচতে পারি। তার স্বামী তাকে ফেলে কলকাতায় থাকে। ফুর্তি করে। তার ছেলেমেয়ে হয়নি। হাতে কাজ নেই। বসে বসে বই পড়ে আর হা-হুতাশ করে। স্বামীর কাছে আদর যত্ন না পেলে শুধু বই পড়ে তো আর মন ভরে না।

তা বলে নীপুকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারিনে। আমার স্বামী জানতে পেলে রক্ষা থাকবে না। ভাই-বোন দু'জনেরই মাথায় ঘোল ঢেলে উলটো গাধায় চাপাবে। আর শাশুড়ী বুড়ীই বা কম কী! নিজের মহলে বসে সব খবর রাখেন। নীপুকে আমি সাবধান করে দিই, কিন্তু সে কি কথা শোনে। সে বলে, তোমার লেখা আমি জামাইবাবুকে দেখাবই দেখাব, যদি না তুমি তোমার জাকে আর একটি বার দেখাও। নীপুকে তো দেখেছেন। অমন গোঁয়ার গোবিন্দ কি দুটি আছে! সে সব পারে। তাই ভয়ে ভয়ে আবার তাদের চোখাচোখি ঘটতে দিই। তার পরে আবার। আবার। আবার।

তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। এক সঙ্গে বসে আলাপ করবে। গল্প করবে। আমাকে সারাক্ষণ পাহারা দিতে হবে। কখন কে এসে পড়ে। দেখতে পায়। আমার তো আর কোনো কাজ নেই। পাহারা দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ। ভাগ্যিস ছেলেমেয়েরা বাইরে খেলা করে। কেবল বড় মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। তাকে ভুলিয়ে ঠাকুর ঘরে আটক রাখি। মালা গাঁথতে দিই।

এক দিন চোখে পড়ে গেল নীপু ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দেখে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। এতটা ভালো নয়। আমি বললুম, নীপু, বেরিয়ে যাও। নীপু বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় আগুন বর্ষণ করে গেল। বুঝতে পারলুম এবার আমার পরিত্রাণ নেই। আমার লেখা আমার স্বামীর দরবারে পেশ হবে। কাল্পনিক নায়কের সঙ্গে কাল্পনিক প্রেমালাপকে তিনি সত্যিকার নায়কের সঙ্গে সত্যিকার প্রেমালাপ বলে বিশ্বাস করবেন। কাল্পনিক অভিসার, কাল্পনিক বিহার এসব তাঁর কাছে সত্য মনে হবে। আর কী! এবার তৈরি হতে হবে কবরের জন্যে। শয়নমন্দির হবে আমার সমাধিমন্দির। গলা টিপে মারলে কি কেউ টের পাবে!

আপনাকে যখন চিঠি লিখি তখন এই ছিল আমার মনের অবস্থা। আমার ভাই আমাকে চরমপত্র দিয়েছিল, হয় মিলন ঘটিয়ে দাও নয় প্রাণের মায়া ছাড়ো। যে ডুবতে বসেছে সে হাতের কাছে যাই পায় তাই চেপে ধরে। আপনি ছিলেন আমার হাতের কাছের খড়কুটো। জানতুম আপনার ক্ষমতা নেই। তবু একবার হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। আহা, আপনি যদি সেদিন আমাকে একটু আশ্বাস দিতেন! তা হলে আমার জীবনের গতি অন্য রকম হতো। এ যা হলো এ কী আমি ভেবেছিলুম!

আপনার উত্তর না পেয়ে আমি চার দিক অন্ধকার দেখি। হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে যায়, বাপের বাড়ী পালিয়ে যাই না কেন? তা হলে নীপু আমার উপর চাপ দেবার চেষ্টা তখনকার মতো ছেড়ে দেবে। দাঁতে ভয়ানক যন্ত্রণা, কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখানো দরকার, এই অছিলায় অনুমতি পাই স্বামীর। আমার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নীপুও চলে যেতে বাধ্য হয়।

আমাদের কলকাতার বাড়ীতে নীপুর আলাদা একটা ঘর ছিল সেটার দরজা সব সময় বন্ধ। হয় ভিতর থেকে, নয় বাইরে থেকে। চাবী নীপুর কাছে। আমার লেখাগুলো তার কোনো একটা বাক্সয় লুকোনো থাকত। কী করে সেগুলো হাত করি এই হলো আমার দিবারাত্র চিন্তা। নিজে তো পারব না। আর কেউ পারে কি না ভাবতে ভাবতে নীপুর বন্ধু কঙ্কর কথা মনে এলো।

কঙ্ক আমার চেয়ে বয়সে বছর তিনেকের ছোট। ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। বিয়ের পরে ওর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতো না। কদাচ কখনো বাপের বাড়ী এলে দৈবাৎ দেখা হয়ে যেত। ও যে আমাকে দূর থেকে পূজা করত তা কোনো দিন বলেনি। আমিও অনুমান করিনি। তবে ওর উপর আমার একটা নির্ভরতার ভাব ছিল।

মনে হতো যদি কখনো বিপাকে পড়ি, কঙ্ক আমার জন্যে যথাসাধ্য করবে। তবে নীপুর বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে মানুষমাত্রেরই উপর আমার আস্থা টলেছে। কঙ্ক তার ব্যতিক্রম নয়।

একদিন আমার ছোট ছেলেমেয়েদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখাতে নিয়ে যাই। কঙ্ক যায় আমাদের প্রদর্শক হয়ে। সেই অবকাশে খুলে বলি সব কথা। নীপু যদি আমার লেখাগুলো আমার স্বামীকে দেয় তা হলে আমার মরণ ডেকে আনবে, কঙ্ক যেন দয়া করে এটা তাকে বোঝায়। সে যদি বোঝে তা হলে বাঁচা গেল, নয়তো লেখাগুলো যেমন করে হোক তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে। এর জন্যে যদি তাকে ঘুষ দিতে হয় তো দেওয়া যাবে। গয়না বিক্রীর ভার কঙ্কর উপরে। যদি কিছুতেই কিছু না হয় তা হলে লেখাগুলো তার বাক্স থেকে চুরি করতে হবে। ধরা পড়লে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কঙ্ক যদি এটা পারে তা হলে আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। সে আমার প্রাণ রক্ষা করবে।

কঙ্ক এক কথায় রাজী হয়ে গেল। সে বেশী কথার লোক নয়। চিরকালই চাপা। তার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন আমার কাজে লাগতে পারবে ভেবে ধন্য বোধ করছে।

তার পরে সে নীপুকে কী বলেছিল, কিছু বলেছিল কি-না, জানিনে। একদিন দেখি নীপুর ঘর খোলা। বাক্স খোলা। কাগজপত্র পুড়ছে। নীপু তাড়া করছে কঙ্ককে। নীপুর হাতে পেনসিলকাটা ছুরি। কঙ্ক পালাবার পথ পাচ্ছে না। নীপুর সাঙ্গোপাঙ্গ দরজায় খাড়া। আমি যদি মাঝখানে গিয়ে না পড়তুম তা হলে কঙ্ক সাংঘাতিক জখম হতো। হয়তো মারা যেত। আমারই হাত গেল কেটে। রক্তে ঘর ভেসে গেল। কঙ্ক তা দেখে নিজের প্রাণ বাঁচাবে কী, আমার সেবা করতে লেগে গেল। নীপু লজ্জা পেয়ে সরে পড়ল।

সরে পড়ল বটে, কিন্তু লেগে রইল পেছনে। কঙ্ককে খুন না করে

সে ছাড়বে না। কঙ্ক তাকে তার বাঞ্ছিতা থেকে বঞ্চিত করেছে। অতৃপ্ত কামনা যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা প্রত্যক্ষ করি নিজের ভাইয়ের হিংস্র-নিষ্ঠুর চোখে। তখন থেকে আমার ব্রত হলো কঙ্ককে বাঁচানো। সে আমার প্রাণরক্ষা করেছে, আমি তার প্রাণরক্ষা করব।

এর পরে যা ঘটল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। এটা আমার জীবনের সব চেয়ে বড় বিস্ময়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কঙ্ক আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করত। একদিন সে আমার দিকে এমন করে তাকালো যে আমি বিনা কথায় বুঝতে পারলুম সে আমাকে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, সে আমাকে ছেলেবেলা থেকে ভালোবেসে আসছে। আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল বলে দেখতে পাইনি। এখন আমার দৃষ্টি খুলে গেছে। আমি যেন আত্মহারা হয়ে গেলুম। এ কী কখনো সম্ভব যে কেউ আমাকে ভালোবাসে! আমার তো ধারণা ছিল কেউ ভালোবাসে না আমাকে। নিতান্ত প্রেমহীন জীবন আমার। লোকে বলে রানী, কিন্তু আমি তো জানি আমি ভিখারিণী। স্বামীর কাছে আমার দেহের কিছু দাম আছে। কিন্তু আমার হৃদয়ের দাম সিকি পয়সাও নয়। কঙ্ক আমাকে জাগালো। আমি প্রিয়া, আমি বহু সাধনার ধন। আমার জন্যে একজন নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে।

কঙ্ক আমাকে ভালোবাসে, কঙ্ক আমার প্রাণরক্ষা করেছে, কঙ্কর প্রাণ বিপন্ন। কেমন করে তাকে ফেলে স্বামীর কাছে ফিরে যাই। এই হলো আমার প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের প্রশ্ন। তার সঙ্গে যোগ দিল আর এক জিজ্ঞাসা। লজ্জা করে আপনার কাছে মুখ ফুটে বলতে। বলতুম না যদি না জানতুম যে আপনি আমার দাদার চেয়েও আপন। আপনি যে আমার কী সে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বোঝাতে পারিনে।

কাউকে বলিনি, আপনাকে বলছি। যে নারী প্রিয়া হয়নি মা হয়েছে সে কি তা বলে প্রিয়া হবার আনন্দ পাবে না? মাতৃত্বের মহিমা আমি

মানি। তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হলে আমি ক্ষুণ্ণ হব। কিন্তু ওই কি সব? আর কোনো সার্থকতা, আর কোনো উপলব্ধি নেই মানবীর জীবনে? আমি তো দেবী নই, দেবীর অভিনয় করে তৃপ্তি পাব কী করে?

আমি ফিরে গেলুম না, মনে হলো ফিরে যাবার পথ নেই। প্রেমহীন সার্থকতাহীন নিষ্ফল জীবনে ফিরে যেতে চাওয়া মরণকামনা ছাড়া আর কী! তার চেয়ে অচেনা অজানা কোনো দেশে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা শ্রেয়। কঙ্ককে বললুম, চল বেরিয়ে পড়ি। প্রস্তাবটা আমারই। ওর নয়।

তার পর আমরা কয়েক দিন ধরে কত রকম জল্পনা কল্পনা করলুম। কোথায় যাব, কী করব, এই সব। আইন-কানুন আমি জানিনে বুঝিনে। কঙ্ক বলল, হিন্দু মতে আমাদের বিয়ে হতে পারে না। মুসলমান মতে হতে পারে। তাতে কি তোমার রুচি হবে? আমি বললুম, কিছুতেই আমার অরুচি নেই। ক্রিশ্চান হতেও আমি রাজী। তবে তোমার কী দশা হবে তাই ভাবি। কঙ্ক বলল, আমার কপালে আছে ত্যাজ্য পুত্র হওয়া। চাকরিই করতে হবে আমাকে। লক্ষ্মী যখন সদয় হয়েছেন তখন জীবিকাও জুটে যাবে। তুমিই আমার লক্ষ্মী। আমি বললুম, শুধু লক্ষ্মীর মতো চঞ্চলা নই। দেখবে সারা জীবন জগদ্দল পাথরের মতো অচলা হয়ে থাকব।

দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই মনে হতে লাগল আমার ছেলেমেয়েদের কার কাছে রেখে যাব? তাদের কী দশা হবে? তাদের কী অপরাধ? কেন তাদের ফেলে যাব? মা কোথায় বলে তারা যখন কান্না জুড়ে দেবে তখন কে তাদের শান্ত করবে? কী তাদের সান্ত্বনা? রাতের পর রাত তাদের কোলে চেপে ধরে কেঁদেছি। তাদের জন্যে প্রার্থনা করেছি। আমার সাধ্য থাকলে আমি তাদের মা হয়ে তাদের কাছেই থেকে যেতুম। কিন্তু মৃত্যুর মতো প্রবল এক শক্তি আমাকে

টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কঙ্কর কাছে তার প্রিয়া হতে। আমার মনে হলো আমি মরে গেছি। মৃত্যুর পরে কে কার মা, কে কার ছেলেমেয়ে!

শেষ পর্যন্ত নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না যে চলে আসতে পারব। পারলুম কিন্তু। এর পরের ঘটনা আপনি জানেন।

রানীর কথা অবাক হয়ে শুনছিলুম। শোনা শেষ হলেও নির্বাক হয়ে রইলুম। স্বভাবত আমি আবেগপ্রবণ। আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়েছিল। তা ছাড়া, বলবার আমার কী ছিল! ধর্মত্যাগ করা উচিত নয়। সমাজত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্তু গৃহত্যাগ করা উচিত কি অনুচিত আমি বিচার করবার কে! পারতপক্ষে কি কোনো মেয়ে গৃহত্যাগ করে? বিশেষত যে মেয়ে মা হয়েছে। আর এ তো শুধু গৃহত্যাগ নয়, রাজত্ব ত্যাগ। রাজরানী হয়েও যে গৃহত্যাগ করতে পারে তাকে আমি ঘৃণা করব, না শ্রদ্ধা করব? আমার চোখে জল এলো।

রানী তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, আশীর্বাদ করুন যেন দৃঢ় থাকি। যেন ভেঙে না পড়ি। দিন দিন ভয় আমার বাড়ছে মানুষের স্বরূপ দেখে। কঙ্ক মহৎ, তার কথা আলাদা। কিন্তু পথে ঘাটে যাদের দেখেছি ও দেখছি তাদের সম্বন্ধে আতঙ্ক আমার বদ্ধমূল। সুফিয়ান সাহেব যে ক'দিন আমাদের আশ্রয় দেবেন তাও জানিনে। জীবিকার সুরাহা এখনো হলো না। গয়না বেচার টাকা ফুরিয়ে আসছে। ঝি হতে আমি রাজী আছি। কিন্তু কঙ্ক তা হলে আত্মহত্যা করবে।

আমার দু'চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা ঝরতে থাকল। হায়! আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমিই দিতুম একটা চাকরি! কিন্তু আপনি যেতে পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। আমি দু-এক বার মুখ ফুটে কিছু বলতে চেষ্টা করলুম। বেরোল কয়েকটা অর্থহীন ধ্বনি। ভাব থাকলে তো ব্যক্ত হবে! ভাবের ঘরে শূন্য।

চাকরির জন্যে সুফিয়ানকে অনুরোধ উপরোধ করে আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। আবার নিজের কাজে যোগ দিই। রাজা তত দিনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এমন কী পাগলামি যে তাঁর স্ত্রীকে তিনি দেখতে পাবেন না! দেখলেই পাগলী খুনোখুনি বাধাবে! এমন কী পাগলামি যে ছেলেমেয়েরাও মা'র কাছে যেতে পাবে না! গেলে কামড়ে দেবে!

আমার অবস্থা হেরম্ব মৈত্র মশায়ের মতো। জানি, কিন্তু বলব না। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করি। তবে সমবেদনা জানাতে ভুলিনে। হোক না পাষণ্ড, মানুষ তো!

আরো মাস খানেক পরে রাজা আর বাগ মানলেন না। চললেন কলকাতা। আমি প্রমাদ গণলুম। রানীকে যদি ওরা দেখতে না দেয় উনি জোর করে দেখতে চাইবেন। দেখতে না পেলে অনর্থ বাধাবেন। বাতাসে একটা থমথমে ভাব ছিল। ঝড়ের আগে যেমন হয়। কোন দিন খবর আসবে কী একটা ট্র্যাজেডী ঘটেছে। ভাবতে গেলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

হলো কী শুনবে? শুনে অবাক হবে যে রাজা ফিরলেন রানীকে সঙ্গে নিয়ে। হাঁ, আসল রানী। নীপু এসেছিল, আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি আমরা। ঠিক তিন দিন আগে দিদিকে ধরে এনে বন্দী করেছিলুম চিলেকোঠায়। কী করে তার সন্ধান পেলুম, ভাবছেন? দিদি চিঠি লিখেছিল তার সইকে। জানতে চেয়েছিল তার ছেলেমেয়ের কুশল। সই তার ঠিকানা ফাঁস করে দেয় তার ছেলেমেয়েদের দেখতে এসে। তক্ষুনি আমি ভোপাল রওনা হয়ে যাই। সঙ্গে ছিল সেখানকার পুলিশ কমিশনারের নামে একখানা চিঠি। সুফিয়ানকে সেটা দেখাতেই চিচিং ফাঁক। হারেম থেকে বেরিয়ে এলো দিদি। চলো আমার সঙ্গে। এই বলে আমি তাকে গ্রেপ্তার করলুম।

বেচারির গায়ে জোর থাকলে তো বাধা দেবে! শুকিয়ে আধমরা হয়ে গেছে। কঙ্ক সেখানে ছিল না। শুনলুম তার একটা চাকরি জুটেছে। সে আপিসে গেছে। তার নামে একটা চিঠি রেখে এলুম। না, বিয়ে হয়নি।

তাজ্জব ব্যাপার! আমি একটি কথাও বললুম না। যদি টের পায় যে আমিই চাকরির জন্যে বলে কয়ে এসেছিলুম। বিয়ে যে হয়নি তাতেও আমার হাত ছিল।

এর পরে প্রায়ই শোনা যেত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। মনে হতো রাজা রানীকে মারধোর করছে। বিশ্রী লাগত। ইচ্ছা করত ইস্তফা দিয়ে চলে যাই। একদিন কথাটা ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে পাড়লুম। রাজা শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে ছি ছি! আমি কি তেমন লোক! আমি কি বুঝিনে যে পাগলকে মেরে কোনো ফল নেই! তাতে পাগলামি সারে না। তবে তাকে চব্বিশ ঘণ্টা তালা বন্ধ করে রাখতে হয়। নয়তো কখন কাকে কামড়ে দেবে! কাচ্চা বাচ্চাদের তার ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। জানালা দিয়ে তারা উঁকি মেরে দেখে। চিড়িয়াখানার বাঘ দেখার মতো। আমি তো শত হস্ত দূরে থাকি। তবু আপনাদের ধারণা আমি মারধোর করি! ছি ছি ছি!

শুনে আমার চক্ষুঃস্থির। এর চেয়ে দু'টো চড় চাপড় ভালো। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনে। বলতে পারিনে যে রানী পাগল নন। ওটা একটা অপবাদ। অথচ বলা উচিত। জানি, কিন্তু বলব না, নীতি হিসেবে এটা সব সময় খাটে না।

চাকরিটা বড় ভালো লেগেছিল হে। ছাড়তে চাইনি। তাই মুখ বুজে সহ্য করেছি নারীর উপর অবিচার ও অত্যাচার। কিন্তু ছাড়তেই হলো।

এক দিন সন্ধ্যা বেলা নিজের ঘরে বসে লিখছি। রাজা গেছেন

শিকারে। এমন সময় সামনে চেয়ে দেখি স্বয়ং রানী। ভূত দেখলেও আমি অতটা চমকে উঠতুম না। চেহারাটা প্রায় ভূতের মতো হয়ে এসেছে। হাতগুলো সরু সরু, মুখটা ধবধবে শাদা। বসতে আসন দিয়ে নিজে হাত জোড় করে দাঁড়ালুম। তিনি রানী, আমি প্যালেস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। অন্দর থেকে কোনো দিন তাঁকে বাইরে আসতে দেখিনি। এ অঘটন ঘটল কী করে তাই ভাবছিলুম।

তিনি বোধ হয় তা আন্দাজ করেছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, ভুলে যাচ্ছেন, আমি যে পাগল। পাগলের সাত খুন মাফ।

বুঝতে পেরে বললুম, হাঁ, হাঁ, পাগল বৈকি। বদ্ধ পাগল।

রানী কেঁদে ফেললেন।

আমারও চোখের পাতা শুকনো ছিল না। ভাবছিলুম বাইরে কেউ নেই তো? মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলুম। না, কেউ নেই।

রানী আমাকে বসতে বললেন। বসলুম বটে, কিন্তু না বসারই শামিল। সমস্ত ক্ষণ উসখুস করতে থাকলুম। যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে। রানীর কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাগল হবার ঐ এক সুবিধা।

বললেন, আপনি কি চান না যে আমি বাঁচি?

বললুম, নিশ্চয় চাই। আমাকে বিশ্বাস করুন।

তা হলে আমাকে বাঁচাবার জন্যে কী করছেন, বলুন? কঙ্ক কোথায়? কঙ্ককে আমার কাছে এনে দিন। নয়তো আমাকেই নিয়ে যান তার কাছে।

আমি—আমি—

হাঁ, আপনি। আপনি পারেন, যদি ইচ্ছা করেন। চাকরিটা যাবে, তা যাক। আবার হবে। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। আসুন, আজকেই আমরা পালাই। এই দণ্ডে, এই মুহূর্তে।

না, না। তা কি হয়? আমি যে—

কেন, কিসের এত ভয়? কী করতে পারে রাজা আপনার? আসুন, বেরিয়ে পড়া যাক। যেখানে কষ্ট আছে সেখানে আমাকে নিয়ে চলুন। আমাকে তার হাতে ধরে দিয়ে তার পর আপনার ছুটি। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। আপনার তো বৌ নেই। বাধা দিচ্ছে কে?

আমার মনে খটকা লাগছিল। এ মেয়ে সত্যি পাগল হয়নি তো? চুপ করে থাকলুম। পাগলের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কী হবে? কথায় কথা বাড়ে।

রানী বললেন, দাদা, আপনি আমার শেষ আশা ভরসা। আপনি সহায় না হলে আমি একা পালাতে পারব না। সহজেই ধরা পড়ব। আপনি কি আমাকে বাঁচবার সুযোগ দেবেন না? আপনি কি পাষাণ? না, না, আপনি হৃদয়বান। আসুন—

আমার তখন দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরছে। হায়, আমি যদি সত্যিকারের নাইট হয়ে থাকতুম তা হলে কি আমাকে এত বার সাধতে হতো? আমি হাত বাড়িয়ে দিতুম। ভেবে দেখতুম না কী আছে আমার ভাগ্যে। জেল না খুন না কলঙ্ক।

হাত জোড় করে বললুম, দিদি, পারব না।

রানী যেমন চুপিসারে এসেছিলেন তেমনি চুপিসারে চলে গেলেন। আমি সেদিন রাত জেগে আমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে তার পরের দিন ভোর হতে না হতে ফেরার হলুম। রেখে গেলুম রাজার নামে একখানা ইস্তফাপত্র। কোনো কৈফিয়ৎ দিলুম না।

কলকাতা পৌঁছে প্রথম কাজ হলো নীপুর সঙ্গে দেখা করা। তাকে বললুম, তোমরা যে পাগলামির অপবাদ রটিয়েছ তার পরিণাম কী হয়েছে জানো? দিদিকে যদি বাঁচাতে চাও এখান থেকে ডাক্তার নিয়ে যাও।

ডাক্তার তাঁকে দেখে বলুক যে পাগলামি সেরে গেছে। নইলে যা হবে তা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সেইজন্যে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

নীপু বলল, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করছি।

নীপুর কাছেই শুনলুম, শুনে আশ্চর্য হলুম যে কঙ্ককেও ধরে আনা হয়েছে। কঙ্ক কিন্তু সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। এবং তার পাগলামির স্বযোগ নিয়ে তার গুরুজন তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। নইলে হয়তো সে কোনো দিন বিয়ে করত না, সেরে উঠে আবার উধাও হতো।

উঃ। ইচ্ছা করল বুকটা চেপে ধরে বসে পড়ি। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছিল। এত দুঃখ আছে এ জগতে! মানুষই তার স্রষ্টা। বৃথা বিধাতাকে দোষ দিই আমরা। বাব্‌বা, এ জাতের চরণে প্রণাম।

আমারও মন কেমন করছিল। শুধু শুনতে চাইলুম, রানী বেঁচে আছেন তো?

আছেন।

আর কঙ্কর পাগলামি সেরে গেছে তো?

গেছে।

তার পর?

তার পর আর কী। মরে যাওয়াটা ট্রাজেডী নয়, বেঁচে থাকাটাই ট্র্যাজেডী। পাগল হওয়াটা ট্র্যাজেডী নয়, না হওয়াটাই ট্র্যাজেডী। যদিও লোকে ভাবে ঠিক উলটো।

প্রিয়দর্শনদার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। মিহিজামেই শেষ দেখা। রাজশাহী বদলি হয়েছি শুনে তিনি হৃষ্ট হয়েছিলেন। উত্তর

মজে যাচ্ছি, নিশ্চয় সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু ছিলুম মাত্র সাত-আট মাস। যোগাযোগ ঘটেনি। তার পরে অনেক দূরে চলে যাই। চট্টগ্রাম।

বিদায়ের আগে সেখানকার বন্ধুদের একটা ভোজ দিই। প্রিয়দর্শনদাও ছিলেন। বার বার বললেন, পুনর্দর্শনায় চ। আমি বললুম, পুনর্দর্শনের দিন হয়তো আপনি দেখবেন আমাকে যা লিখতে দিয়েছেন তা আমি লিখেছি। তখন খুশি হবেন তো?

নিশ্চয় খুশি হব, ভাই। নিশ্চয় খুশি হব। জীবন মানুষকে খুশি করে না সব সময়। আর্ট তা করে। পুনর্দর্শনায় চ। পুনর্দর্শনায় চ।

প্রিয়দর্শনদা, এত দিন পরে লিখে উঠতে পারলুম। কিন্তু আজ আপনি কোথায়। আজ পয়লা অগ্রহায়ণ তেরো শ' আটায়। লেখা শেষ করে ভাবছি কাকে পড়ে শোনাব। কে খুশি হবে।

(১৯৫০-৫১)